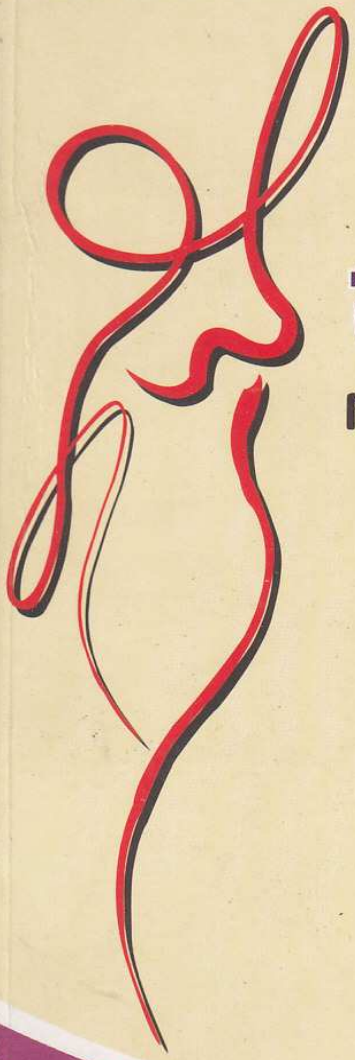

নারীর কথা

NARIR KATHA

THE HUNGER PROJECT

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

নারীর কথা-৮

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৩ উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদনায়

ড. বদিউল আলম মজুমদার

৮ মার্চ, ২০১৩

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

Narir katha 8

Collected writings on the occasion of International Woman's Day

Published by:

The Hunger Project

3/7 Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka-1207

Tel: 8802-913-0479

Website: www.thp.org and www.thpbd.org

সম্পাদকীয়ঃ

মাত্র কয়েক দশক আগেও বাংলাদেশে নারীদের প্রধান পরিচয় ছিল গৃহবধূ। ঘর-গৃহস্থালির কাজকর্ম করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা শিকার হতো বৈষম্য ও অবহেলার। এ যেন চিরস্থায়ী সমাজ স্বীকৃত নিয়ম। কিন্তু বর্তমান চিত্র অনেকটাই ভিন্ন। বাংলাদেশের নারী সমাজ বিশেষ করে গ্রামীণ নারীরা নীরবে নিভৃতে জেগে ওঠতে শুরু করেছে। সব সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে তারা আজ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে ভূমিকা পালন করে চলেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ে উঠছে সমাজ উন্নয়নের মডেল। যাদের দেখে সমাজের অন্যান্য অবহেলিত নারীরাও বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি ২৫ লাখ ১৮ হাজার। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়, তা আজ সবাই অনুধাবন করতে পারছে। সামাজিক অগ্রগতিতে নারীরা অবদান রাখার কারণে কমে যাচ্ছে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ।

কিন্তু বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নারীদের সফলতার কাহিনী খুবই নগণ্য মাত্রায় তুলে ধরা হয়। বরং সংবাদের একটি বড় অংশ জুড়েই থাকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুর্ঘটনার খবর। এসব সংবাদ নাগরিক জীবনে তৈরি করে হতাশা। তা ছাড়া গণমাধ্যমগুলো শহরমুখী তথা রাজধানীকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড দ্বারাই প্রভাবিত। অথচ গ্রামীণ নারীদের সফলতার চিত্রগুলো গণমাধ্যমে সঠিকভাবে তুলে ধরা গেলে নারীরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। সমাজের উন্নয়নে আরও বেশি পরিমাণে তারা ভূমিকা রাখতে পারবে এবং নতুন স্বপ্নের এক সমাজ গঠনে নারী-পুরুষ এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাবে।

এ বিষয়টি অনুধাবন করেই দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সফল হওয়া বেশ কিছু গ্রামীণ নারীর গল্প নিয়ে এই বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

গল্পগুলোর প্রতিটিই স্ব-উদ্যোগের। বাইরের অর্থ ও সাহায্য এ সব উদ্যোগের মূল চালিকাশক্তি নয়। এসব উদ্যোগ একটি গণকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র উজ্জীবক প্রশিক্ষণ কাজ করছে যার অনুপ্রেরণা হিসেবে। কাহিনীতে উলেখিত নারীরা স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে, স্থানীয় নেতৃত্বে নিজের এবং সমাজের উন্নয়নে অসংখ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশব্যাপী ইউনিয়নভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে কর্মশালা, উঠান বৈঠক ও দক্ষতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-এর আয়োজন করে থাকে। এর মাধ্যমে তারা উজ্জীবিত ও সংগঠিত হয়ে উঠছে। প্রতিরোধ করছে যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন এবং বাল্য বিবাহের মত সামাজিক অনাচার। একই সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে সঞ্চয়ের মানসিকতা নিয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলছে। সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে আত্মনির্ভরশীল সমাজ বিনির্মাণে। এ গ্রন্থে প্রকাশিত গল্পগুলো তারই প্রচেষ্টা ও দৃষ্টান্তেরই প্রামাণ্য দলিল।

আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যারা নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তৃণমূল পর্যায়ে এ সকল সাফল্যগাথা সংগ্রহ করেছেন। আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও কিছু মুদ্রণজনিত ও আনুষঙ্গিক ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ গল্পগুলো যদি অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে, তবে সেটিই হবে এ গ্রন্থের সাফল্য।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চায় গীতা মজুমদার

মেহের আফরোজ মিতা

গীতা মজুমদার। জন্মগ্রহণ করেন সাধারণ একটি পরিবারে। কিন্তু তার রয়েছে অসাধারণ প্রজ্ঞা আর জনমানুষের সেবা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। নারী নেতৃত্বের বিকাশ, নারী সমাজের উন্নয়নে তিনি এগিয়ে চলছেন নিরলসভাবে। আর এজন্য তিনি বের হয়ে এসেছেন স্বার্থপরতার গণ্ডি থেকে। গীতা মজুমদারের জন্ম বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের আহুতি বাট্টরা গ্রামে। ঈশ্বরভক্ত ঠাকুমা আদর করে তার নাম রাখেন গীতা। বাবা হরিমোহন মজুমদার ও মা অনন্তী মজুমদারের ৩ পুত্র ও ৩ কন্যার মধ্যে গীতা তৃতীয়।

গীতার শিক্ষাজীবন শুরু হয় বাহাদুরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পঞ্চম শ্রেণী পাশ করে ভর্তি হন বাহাদুরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এ স্কুল থেকে ১৯৮২ সালে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি পাশ করেন। প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রথম স্থান ছিল তার দখলে। তারপরও পড়ালেখার ক্ষেত্রে পরিবার থেকে গীতা খুব সহায়তা পান নি। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিকূলতা তার লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। ১৯৮৪ সালে আগৈলঝাড়া কলেজ থেকে এইচ.এস.সি এবং ১৯৮৮ সালে মাদারীপুর নাজিমউদ্দীন ডিগ্রী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন তিনি।
গীতার বয়স হয়েছে, তাই বিয়ে দরকার। কিন্তু তার গায়ের রং কালো বলে বিয়ের প্রস্তাবগুলো সামনে এগোয় না। কেউ কেউ আবার বিয়েতে যৌতুক দাবি করে। মনে মনে জেদ করলেন গীতা। শুধু গায়ের রঙ কালো বলে যৌতুক দিয়ে তাকে বিয়ে করতে হবে? বিয়ের পিড়িতে না বসার স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন গীতা। স্বাবলম্বী হয়ে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার সংকল্প নেন তিনি।

গ্রামের বাড়ি ছেড়ে গীতা চলে আসেন ঢাকায়। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। ১৯৯৫ সালে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংগঠন একশন এইড-এ যোগদান করেন। সংস্থার পক্ষ থেকে তাকে কিশোরী উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করার জন্য জামালপুর জেলার দেয়ানগঞ্জে পাঠানো হয়। সেখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আবার ঢাকায় ফিরে আসেন তিনি। বস্তি এলাকায় নামেন এক নতুন মিশন নিয়ে। আগারগাঁ, রায়ের বাজার, ট্যানারী মোড়, কাটাসুরসহ বিভিন্ন বস্তির ৯ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোরীদের সংগঠিত করে সেলাই, পিঠা তৈরি ও এ্যামব্রয়ডারী প্রশিক্ষণ দিতেন। এসব কাজে প্রশংসণীয় সাফল্য অর্জন করায় তাকে ডেকে পাঠায় ইউএসসি কানাডা নামক একটি বিদেশী এনজিও এর কান্ট্রি ডিরেক্টর। তিনি গীতাকে বলেন, কিশোরীদের শুধুমাত্র আর্থিকভাবে সাবলম্বী করে তুললেই চলবে না, তাদের শিক্ষিতও করে তুলতে হবে। বিষয়টি গীতার চিন্তার সাথে মিলে যায়। এরপর এ সংস্থার পক্ষ থেকে গীতাকে বস্তির কিশোরীদের শিক্ষাদানের ওপর ১৮ দিনের এক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের পর তিনি বস্তির দরিদ্র কিশোরীদের নিকট শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

বস্তি পর্যায়ে নারীদের উন্নয়ন ও তাদের ক্ষমতায়িত করতে গীতা যোগ দেন ‘চেম্ফ’ নামক একটি উন্নয়ন সংস্থায়। তিনি বস্তির নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে গঠন করেন ‘কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)’। এ সংস্থার পক্ষ থেকে

আত্মকর্মসংস্থান তৈরির জন্য নারীদের ক্ষুদ্রঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এর পাশাপাশি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, শিশু ও নারী অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে নারীদের সচেতন করে তোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

দীর্ঘদিন ঢাকায় অবস্থানের পর নিজ এলাকার জন্য কিছু করার চিন্তা আসে গীতার মনে। তাই ঢাকা থেকে নিজ গ্রামে ফিরে আবারও নারীদের সংগঠিত করার কার্যক্রম শুরু করেন। স্থানীয় নারীদের নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন 'মুক্তি মহিলা সংস্থা'। ২০০২ সালে মহিলা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন নিয়ে এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি তৃণমূল পর্যায়ের গ্রামীণ নারীদের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। গীতা মজুমদার জানান, তিনি প্রথমে গ্রামের ক্ষেত থেকে পাইকারী মূল্যে হোগলা পাতা কিনে আনেন। তারপর সদস্যদের নিয়ে এগুলো বুনে বাজারে বিক্রি করেন। প্রতিটি হোগলা বিক্রি করে ১২ টাকা লাভ হতে থাকে। এ ছাড়া এ সংস্থার আওতায় তিনি ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন গীতা প্রি-ক্যাডেট স্কুল।

২০০৯ সালের জুলাই মাসে ৮৭০তম ব্যাচের এক সফল উজ্জীবক সাইফুল ইসলামের সঙ্গে গীতার দেখা হয়। তারই অনুপ্রেরণা ও আমন্ত্রণে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ১৪৯৬ তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণ শেষে গীতা নিজের মধ্যে এক ধরনের আত্মশক্তি উপলব্ধি করেন। আর ২০১০ সালের জুলাই মাসে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনব্যাপী 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণ তার আত্মশক্তিকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

প্রশিক্ষণের পর গীতা সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কার্যক্রম বাস্তবায়নে দৃশ্যমান সফলতা অর্জন করায় সামাজিকভাবে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। জনগণের দাবির মুখে গীতা ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মেম্বার প্রার্থী হন। সৎ ও যোগ্য প্রার্থী হিসাবে তিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর তার দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। বর্তমানে বিধবাভাতা ও বয়স্কভাতা বিতরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। গীতা একইসাথে রাজিহার ইউনিয়ন চাষী কল্যাণ সমিতি, ব্র্যাক ওয়াশ প্রোগ্রাম ও সি.এইচ.সি.পি, সি.বি.ও এর সভানেত্রী এবং আহুতী বাট্টা পাবলিক স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

গীতা মজুমদার তার নিজ ওয়ার্ডের ওয়ার্ড এ্যাকশন টিমগুলো গঠনে নেতৃত্ব দেয়ার পাশাপাশি দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সকল কার্যক্রমে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। উঠান বৈঠক, অভিভাবক সভা ও সামাজিক ইউনিটের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে শিশুদের জন্মনিবন্ধন ও স্কুলে ভর্তি নিশ্চিতকরণে কাজ করছেন। এ ছাড়া পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ বন্ধ ও যৌতুক বিরোধী সচেতনতা তৈরিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন।

এসব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে এলাকায় গীতা এক ধরনের গণজাগরণ তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তার অনুপ্রেরণায় এক সময় নির্যাতনের শিকার হওয়া অপু মন্ডল, ময়না মজুমদার ও সমাপ্তির মত নারীরা এখন বলিষ্ঠ নারীনেত্রী হিসেবে গড়ে উঠেছে। পিছিয়ে পড়া নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন গীতা মজুমদার। গীতা মজুমদার আমৃত্যু কাজ করে যেতে চান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে।

অপরাজিতা ননী বাড়ৈ

নিয়াজ মোর্শেদ

পুরুষশাসিত সমাজে নারীর পক্ষে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর সাফল্যের সাক্ষাৎ যে সহজ নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারপরও কেউ না কেউ তা সম্ভব করে তোলেন এবং হয়ে উঠেন অনেকের জন্য দৃষ্টান্ত। এমনই এক নারী ননী বাড়ৈ।

১৯৫৭ সালের ১লা মার্চ বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা গ্রামের এক খৃষ্টান পরিবারে ননী বাড়ৈ জন্মগ্রহণ করেন। ৫ বোন আর ২ ভাইয়ের মধ্যে তার অবস্থান তৃতীয়। বাবা দয়াল বৈদ্য একজন সাধারণ মিস্ত্রি, মা পূর্ণেন্দু বৈদ্য একজন গৃহিণী। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ননী বাড়ৈ'র বিয়ে হয় নবম শ্রেণীতে থাকা অবস্থায়। স্বামী মাদারীপুরের মোস্তারকান্দী গ্রামের বাদল হালদার। বিয়ের এক বছরের মাথায় অল্প বয়সেই এক কন্যা সন্তানের মা হন ননী বাড়ৈ।

স্বামী-সন্তান নিয়ে তার সংসার ভালই কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু মেয়ের বয়স যখন চারমাস তখন ননী বাড়ৈ'র স্বামী বাবা-মায়ের ওপর রাগ করে আত্মহত্যা করেন। এতে দুর্দশা নেমে আসে ননী বাড়ৈ'র জীবনে। ৬ মাস পর ফিরে আসেন বাপের বাড়িতে। ধীরে ধীরে মেয়ে বড় হতে থাকে। সংসারের ভরণপোষণ যোগাতে কাপড় সেলাইয়ের কাজ নেন।

এভাবে কেটে যায় প্রায় ৮ বছর। হঠাৎ একদিন ননী বাড়ৈ'র ভাইয়েরা তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। বিয়েতে সম্মতি দেন তিনি। শশীকর গ্রামের বিজয় বাড়ৈ'র সাথে ননী বাড়ৈ'র দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে যায়। মেয়েকে ভাই-বোনের কাছে রেখে যান তিনি চলে আসেন শ্বশুরবাড়িতে। ৬ মাস সেখানে অবস্থানের পর তাকে স্বামীর কর্মস্থল টঙ্গীতে চলে যেতে হয়। প্রায় ৫ বছর সেখানে থাকার পর চলে আসেন শ্বশুরবাড়িতে। এ সময় তার স্বামী কিডনী রোগে আক্রান্ত হন। তাই স্বামীকে সহযোগিতা করার জন্য আবার ঢাকায় চলে যান। শেষ পর্যন্ত অসুস্থতার কারণে তার স্বামী চাকরি ছেড়ে শশীকর গ্রামে নিজের বাড়িতে চলে আসেন।

এরপর ৬-৭ বছর গ্রামের পৈত্রিক জমিজমা থেকে যা আয় হতো তা দিয়েই তাদের সংসার চলতে থাকে। এ সময় এক স্কুল শিক্ষকের সাথে ননী বাড়ৈর মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর তার স্বামী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অসহায় ননী বাড়ৈ মাধবপাশায় দ্বিতীয় ঘরের সন্তান সবুজ বাড়ৈ'কে নিয়ে শুরু করেন নতুন পথচলা। সংসারের খরচ নির্বাহে শুরু করেন সেলাইয়ের কাজ। এ ছাড়া তিনি গ্রামের কিশোরীদের সেলাই প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ায় ননী বাড়ৈ'র সংসার।

২০০৮ সাল। মাধবপাশাতে আয়োজন করা হয় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। বড় ভাইয়ের আমন্ত্রণে এই প্রশিক্ষণে যোগ দেন ননী বাড়ৈ। প্রশিক্ষণের পর তার জীবনে এক পরিবর্তনের সূচনা হয়। ফিরে পান আত্মবিশ্বাস। এই প্রশিক্ষণই তাকে শেখায় জীবন চলার নতুন পথ। ভালবাসতে শেখায় নিজের জীবনকে, সমাজের মানুষকে, সর্বোপরি দেশকে। উপার্জনে আসে ভিন্নমাত্রা। এগিয়ে যেতে থাকেন নতুন স্বপ্নের পথে।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মৎস চাষ ও উঠানের খালি জায়গায় মৌসুমী ফসলের চাষ শুরু করেন। এ ছাড়া বাজার থেকে ৫ টাকা দরে সিমেন্টের বস্তা কিনে এনে শুরু করেন ব্যাগ তৈরির কাজ। ১শ' ব্যাগ তৈরি করতে তার সময় লাগে মাত্র ৩ দিন। এই ব্যাগগুলো মাধবপাশা বাজারের দোকানদাররা কিনে নেন। গ্রামের নারীদেরও তিনি ব্যাগ তৈরির প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। একইসাথে তাদের আরও বিকশিত এবং আত্মবিশ্বাসী করে তুলছেন।

এখানেই থেমে নেই ননী বাড়ৈ। এগিয়ে যাচ্ছেন প্রসূতি মায়ের সেবায়। ঝাঁপিয়ে পড়ছেন বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে। তিনি জানান, ইতোমধ্যে তানিয়াসহ বেশ কয়েকজন মেয়ের বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সফল হয়েছেন। শিক্ষার উন্নয়নেও কাজ করছেন ননী বাড়ৈ। বেশ কিছু ঝরে পড়া শিশুকে করেছেন স্কুলগামী। চালু করেছেন দু'টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রও। গ্রামের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন ভলান্টিয়ার সার্ভিস কেন্দ্র। বিশেষ দিবস উদ্‌যাপন এবং নারী ও শিশুদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন এ কেন্দ্রের কর্মীরা।

২০০৯ সালে ননী বাড়ৈ এবং তার সংগঠনের সফল উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে মাধবপাশায় আসেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। সমাজ উন্নয়নে তাদের উৎসাহ ধরে রাখতে তাদের একটি সেলাই মেশিন উপহার দেন। ড. বদিউল আলম মজুমদারের কাছ থেকে উৎসাহ নিয়ে সমাজ উন্নয়নে নিজেকে সব সময় নিবেদিত রেখেছেন ননী বাড়ৈ।

স্বপ্ন পূরণের পথে আকলিমা

স্বপন সিকদার ও আহসানুল কবীর ডলার

কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার পশ্চিমগাঁয়ের একটি গ্রামীণ ঘর। ঘরটির আসবাবপত্রের বিন্যাস মাঝে জীবনের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এ বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে সংগ্রাম। ঘরের একপাশের ছোট্ট অংশে জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম আসবাবপত্র, অন্যদিকে অধিকাংশ স্থানজুড়ে ৪টি কাপড় সেলাইয়ের মেশিন, কাপড় কাটার জন্য একটি বড় টেবিল এবং কাপড় রাখার জন্য একটি কাঠের আলমারি। একটি মিনি গার্মেন্টস গড়ে তোলার স্বপ্ন লক্ষ্য করা যায়। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে জীবন-সংগ্রামের সাহসী সৈনিকের নাম আকলিমা।

আকলিমা জন্মগ্রহণ করেন ১৯৭৮ সালের ২৯ জানুয়ারি। পিতা মৃত আ: বারেক এবং মাতা হাসিনা বানুর তিন ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে আকলিমা দ্বিতীয় এবং বোনদের মধ্যে প্রথম। বাবা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং মা গৃহিনী। গ্রামের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতই ১৯৮৩ সালে পশ্চিমগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আকলিমার পড়ালেখা শুরু। বাবার ক্ষুদ্র ব্যবসা দিয়ে পরিবারের ভরনপোষণ ও পড়ালেখা চালানো সম্ভব ছিল না। তাই পরিবারের ব্যয় কমানোর জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ১৯৯১ সালে নবম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় ধনী পরিবারের এক বেকার সন্তানের সাথে তাকে বিয়ে দেয়া হয়। স্বামীর কর্মকাণ্ড ও স্বভাব দেখে তিনি উপলব্ধি করেন যে, তার জীবন খুব একটা স্বাচ্ছন্দে কাটবে না। একদিন হয়তো তাকেই সংসারের হাল ধরতে হবে। যেহেতু জীবন সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার শিক্ষা, তাই আবারও পড়ালেখা চালিয়ে যেতে লাগলেন আকলিমা।

১৯৯২ সালে তার কোলজুড়ে আসে প্রথম সন্তান নাজমুল আহমেদ সোহেল। এমনই অবস্থায় ১৯৯৩ সালে এস.এস.সি. পরীক্ষায় অংশ নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন তিনি। সন্তানের সঠিক যত্ন নিতে গিয়ে পড়ালেখার ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি পড়ে আকলিমার। এছাড়া পরিবার তার পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়াকে ভালভাবে নেয় নি। এরমধ্যে ১৯৯৫ সালে ২য় সন্তান রাসেলের জন্ম হয়। সংসারের চাপ সামলাতে গিয়ে আকলিমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। আস্তে আস্তে স্বামীর সাথে মানসিক দূরত্ব বেড়ে যেতে থাকে। বাড়তে থাকে অশান্তি আর যুক্ত হয় নির্যাতন। স্বামীর সংসারে টিকে থাকার সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ, তখন স্বাভাবিকভাবেই আকলিমার জীবনের গন্তব্য হয় তার বাবার বাড়ি।

বাবার সংসারে ফিরে এসে দেখলেন দারিদ্র্যের আরেক রূপ। সংসারের খরচ কমানোর জন্য তাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়া হলেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। এ অবস্থায় সন্তানদের নিয়ে দু'চোখে অন্ধকার দেখতে থাকেন আকলিমা। কিন্তু তিনি হেরে যেতে রাজি নন। অবতীর্ণ হলেন জীবনযুদ্ধে। অবশেষে সানফ্লাওয়ার ইনসুরেন্স কোম্পানীতে বীমাকর্মী হিসাবে কাজ করার সুযোগ পান আকলিমা। এ কাজ থেকে তার মাসিক ১ হাজার ৫শ' টাকা আয় হয়। কিন্তু এত অল্প টাকা দিয়ে দুই সন্তানসহ সংসার পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই চাকরির পাশাপাশি অন্য কোন রোজগারের উপায় খুঁজতে থাকেন। এ সময় তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাপড় সেলাইয়ের কাজ শিখতে শুরু করেন। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আকলিমা শুধু সেলাই শেখার মাঝেই নিজেকে নিয়জিত রাখেননি, বরং নিজেকে সেলাই প্রশিক্ষক হিসাবেও তৈরি করেন।

প্রায় ছয় বছর এভাবেই বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়েই জীবনের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন আকলিমা। ২০০৪ সালে আগষ্ট মাসে নিজেকে নতুন করে চিনে নেয়ার সুযোগ আসে। আজগরা ইউনিয়নের কালিয়াচৌ কিন্ডার গার্টেন-এ দেখা হয় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র কুমিল্লা জেলার সমন্বয়কারী স্বপন সিকদারের সাথে। সংসার জীবনের নানা বিষয়ে তার সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এ সময় স্বপন সিকদার তাকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত ৬২৫তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার আহবান জানান। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

প্রশিক্ষণের পর আকলিমার মানসিক অবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনে। তিনি আবিষ্কার করলেন এক নতুন আকলিমাকে। তিনি বুঝতে পারলেন, শুধু তিনি নন, সমাজের আর দশজন নারীও একইভাবে নানা ধরনের নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন পরিচালনা করছে। সুতরাং শুধু নিজের অবস্থার পরিবর্তন করলেই সকল সমস্যার সমাধান হবে না, সমাজেও আনতে হবে পরিবর্তন। নিজের জীবন গড়ার পাশাপাশি অন্য নারীদের জীবনমান পরিবর্তন এবং তাদেরকে সচেতন করার কাজ শুরু করলেন। প্রশিক্ষণের পরবর্তী এক বছরে আকলিমা বিভিন্ন বিষয়ে ২৪টি কর্মশালার আয়োজন করেন। এর মাধ্যমে স্থানীয় ৩শ' নারীকে তাদের অধিকারসহ নানা বিষয়ে সচেতন করে তোলেন।

একই সাথে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রায় ২শ' নারী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছে। ২০০৮ সালে ২৭তম 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তার আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। ৩ হাজার টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন এবং নিজের ঘরে বসে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। এর ফলে তার আয় বাড়তে থাকে। এর মধ্যে আকলিমার বড় ছেলে এস.এস.সি. পাশ করেছে। পড়াশুনার পাশাপাশি সে বিদ্যুত সংক্রান্ত কাজ করে মাসে প্রায় ৫ হাজার টাকা আয় করছে। আর ছোট ছেলে ২০১৩ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। আর শত ব্যস্ততার মাঝেও আকলিমা উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১২ সালে এইচ.এস.সি পাশ করেন।

অন্যদিকে সেলাইয়ের কাজ করতে করতে কিভাবে নিজের ঘরে একটি মিনি গার্মেন্টস তৈরি করা যায়, সে স্বপ্ন দেখতে থাকেন আকলিমা। স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে তার এই সংগ্রাম অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মধ্যে অন্যতম হলেন গণশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক তাজিমা হোসেন মজুমদার। তিনি আকলিমার স্বপ্ন পূরণের কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। ২০১২ সালে এপ্রিল মাসে তার সহায়তায় আমেরিকান উইমেন্স ক্লাব থেকে আকলিমা ৫০ হাজার টাকা অনুদান পান। এ টাকা দিয়ে মাসিক ২ হাজার ৫শ' টাকায় একটি ঘর ভাড়া করেন তিনি। এছাড়া চারটি সেলাই মেশিন, একটি বড় টেবিল ও কিছু কাপড় ক্রয় করেন। শুরু করেন "গ্রামীণ ড্রেস হাউজ" নামে তার স্বপ্ন পূরনের কার্যক্রম। জীবন সংগ্রামের আদলে সাজানো এই ঘরে আরও চারজন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে এখান থেকে আকলিমার মাসিক আয় ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা।

এক সময় নিজের সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। সময় বদলেছে, এখন এটা আর তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান তার জীবনের চাওয়া-পাওয়া ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। তিনি এখন বিশ্বাস করেন, সামাজিকভাবে অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন না আসলে কখনই নারীদের জীবনে সুখময় পরিবর্তন আসে না, আসবে না। যে আত্মবিশ্বাস দিয়ে আকলিমা তার জীবনের পরিবর্তন এনেছেন, একইভাবে সমাজের অন্যান্য নারীদের আত্মবিশ্বাসীরুপে গড়ে তুলে তাদের অবস্থার পরিবর্তনে কাজ করে যাচ্ছেন। নিজে থেকে বদলে যাওয়া এবং মানুষকে বদলে দেয়ার অন্যতম উদাহরণ এক নারী - আকলিমা।

কোনাখালীর হ্যাপীঃ এক অদম্য সমাজকর্মী

স. ম. ইকবাল বাহার চৌধুরী

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়ন। উন্নয়নের কোন ছোঁয়া লাগেনি এ ইউনিয়নে। লেখাপড়ার জন্য নেই পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বেশিরভাগ মানুষই বাস করে দারিদ্র্যসীমার নিচে। বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় রাত এলেই অন্ধকারে ডুবে যায় গোটা ইউনিয়ন। প্রত্যন্ত এই জনপদে যেন আলোকছটা হিসেবে কাজ করে চলেছেন হ্যাপী; যিনি ইউনিয়নের সবার কাছে নারীনেত্রী হ্যাপী নামেই পরিচিত।

১৯৯০ সালে নয়াঘোনা গ্রামের এক অসহায় পরিবারে জন্ম নেন এই সাহসী প্রতিভা। বাবা এম জাহাঙ্গীর আলম ও মাতা রীনা আকতার। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দরিদ্রতার কারণে যথাসময়ে লেখাপড়া শুরু করতে পারেননি তিনি। কিন্তু প্রতিভা আর অটুট ইচ্ছাশক্তির কারণে ৯ বছর বয়সে তিনি ভর্তি হন কোনাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এ সময় তাকে লেখাপড়ার পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য কাজ করতে হতো। চরম খাটুনি আর খেয়ে না খেয়ে ৮ম শ্রেণী পাশ করেন তিনি। এরপর টাকার অভাবে তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। এতে তিনি খুবই হতাশ ও ভেঙ্গে পড়েন। ছোটবেলা থেকে নারীর ওপর নির্যাতন ও বৈষম্য দেখে হ্যাপী মনে মনে ব্যথিত হতেন আর ভাবতেন- কি করে এসবের অবসান হবে। এ অবস্থার পরিবর্তনে কাজ করে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প নেন হ্যাপী।

এ সময় এলাকায় কোন নারী নির্যাতনের সংবাদ পেলে কিশোরী হ্যাপী তার প্রতিবাদ করতেন। এ নিয়ে গ্রামে তাকে নিয়ে কটু কথা কম হয়নি। এতটুকু মেয়ে মুরুব্বিদের কথায় নাক গলায় কেন? শুধু তা-ই নয়, বাবা-মাও যে তার এই প্রতিবাদী আচরণকে স্বাগত জানাতো এমন নয়, বরং এসব কাজে তাকে বাধা দিতো। কিন্তু হ্যাপী এতে দমে যায়নি। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেড়ে ওঠা হ্যাপীকে খুজে পান 'কর্মনীড়' এর পরিচালক শাহেনা বেগম। ২০০৬ সালে হ্যাপীকে তিনি এলাকায় কিশোরী শিক্ষার জন্য নিয়োগ দান করেন। শুরু হয় হ্যাপীর নতুন পথ চলা। কিছু অর্থের সংকুলান হওয়ায় হ্যাপী আবার পড়ালেখার দিকে মন দেন। ২০০৯ সালে হ্যাপী এস.এস.সি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন।

একই বছর ২০০৯ সালে হ্যাপী অংশ নেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ আয়োজিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণে। শাহেনা বেগমের উৎসাহে তিনি এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নিয়ে হ্যাপী নিজেকে আরও আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলেন। নিজের জীবনের স্বপ্ন পূরণ আর নারীদের উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা আঁকতে থাকেন তিনি। তাঁর সাথে জড়ো হন শারমীন, রাফি, দিলরুবা, তাছলিমা ও হেনুসহ আরও কিছু উদ্যোগী নারী। ঐক্যবদ্ধ কাজ সফলতা বয়ে আনে, এমন চিন্তা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ২০০৯ সালে তারা প্রতিষ্ঠা করেন 'স্বপ্ননীড়' নামক সমবায়ভিত্তিক সংগঠন। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সরকারি সহায়তায় পরিধি বাড়তে থাকে সংগঠনটির। বর্তমানে এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ২৫ জন নারী, যাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৫ হাজার টাকা। এ টাকা থেকে কুটির শিল্পের উপকরণ ক্রয়ের নিমিত্তে বিনা লাভে তারা সদস্যদের ঋণ দিচ্ছেন।

এছাড়া স্বপ্ননীড়-এর মাধ্যমে গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং প্রতিবন্ধীদের টিকা দানসহ নানা সহায়তা দিচ্ছেন তারা। পাশাপাশি নারী নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহ বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কাজ করছেন তারা। এছাড়া স্বপ্ননীড়

থেকে প্রায় ৩০ জন নারীকে সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যাদের অনেকেই প্রশিক্ষণ নেয়ার পর সেলাই এর কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছে।

হ্যাপী জানান, 'স্বপ্ননীড়' এর মাধ্যমে স্থানীয় ৩০ জনকে মাশরুম চাষ এবং ৩০ জনকে গবাদীপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা ও সরকারি সহায়তায় এলাকার ৭শ' পরিবারকে স্যানিটারী ল্যাট্রিন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি।

গ্রামে স্বপ্ননীড়-এর উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষার জন্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। যেখানে ৩০ জন নারী ও ৩০ জন পুরুষকে বয়স্ক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। স্বপ্ননীড় সত্যিই এখন পুরো কোনাঘালা ইউনিয়কে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে। পুরো ইউনিয়ননে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এখন হ্যাপী আর তার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা স্বপ্ননীড়। হ্যাপী জানান, সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়েও তিনি কাজ করছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এ কাজগুলো করতে গিয়ে পরিবার ও সমাজ থেকে বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে; যেমন- ২০১০ সালের ১৫ ডিসেম্বর তার এলাকায় একটি ইভটিজিং-এর ঘটনার প্রতিবাদ করায় তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়। কিন্তু তিনি এতে দমে যাননি। তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিট্রেটের মাধ্যমে বখাটেদের শাস্তি নিশ্চিত করেন।

হ্যাপীর কাজের প্রশংসা করে স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুল নবী বলেন, হ্যাপী যে কাজগুলো করছে একজন নারী হিসেবে তা অনুকরণীয়। একইসাথে তার কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা করা দরকার। বর্তমানে হ্যাপীকে তার পরিবার ও এলাকাবাসীদের কেউই আগের মত বাধা দেয় না। বরং অনেকেই এখন সহায়তা করতে চায়। হ্যাপী বলেন, জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে তিনি আজ এতটুকু পথ পাড়ি দিতে পেরেছেন। গ্রামের নারী-পুরুষদের কম খরচে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হ্যাপী তার ইউনিয়নে একটি হাসপাতাল করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। তার বিশ্বাস, আজ হোক কাল হোক তিনি এ উদ্যোগে সফল হবেন। হ্যাপী জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণই তাঁর জীবনের মোড় বদলে দিয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি তার আত্মশক্তিকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তার এ সফলতায় এলাকার নারীরা উৎসাহ পাচ্ছেন, তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন।

সমাজকর্মী রাণীর এগিয়ে চলা

এ.জি.এম. আলমগীর

কারো সমালোচনায় দমে যাবার মানুষ নন লাভলী আক্তার রাণী। অদম্য mvnm নিয়েই তার সামনে এগিয়ে চলা। আত্মবিশ্বাসের বলে একে একে সব প্রতিকূলতাকে জয় করছেন তিনি।

রাণীর জন্ম ১৯৭৩ সালে, মুন্সিগঞ্জ সদরের পঞ্চসার ইউনিয়নের চরমুক্তারপুর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। বাবা আলাউদ্দিন ও মা লুৎফা বেগমের চার সানের মধ্যে রাণী সবার বড়। কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করলেও উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হওয়ার পরই রাণীকে পোহাতে হয় বিড়ম্বনা। ঘরের বাইরে গেলে মেয়েরা বেপর্দা হয়ে যায়- এমন ধারণা থেকে প্রতিবেশীরা তার ঘরের বাইরে যাওয়াকে ভালো চোখে দেখতো না। এ সময় প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনরা তাকে বিয়ে দেয়ার জন্য উঠে-পড়ে লাগে। কিন্তু মায়ের সহযোগিতার কারণে রাণী বাল্যবিবাহের হাত থেকে রক্ষা পান।

এ অবস্থায় বিভিন্ন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ১৯৮৯ সালে রাণী মুন্সিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি পাশ করেন। এরপর সরকারি হরগঙ্গা কলেজে ভর্তি হন। এ সময় পড়াশুনার পাশাপাশি বাসার কাজে মাকে সব সময় সাহায্য করতেন। কিন্তু দৃঢ় মনোবল নিয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যান। ফলশ্রুতিতে তিনি ১৯৯১ সালে কৃতিত্বের সাথে এইচ.এস.সি পাশ করেন। এখানেই রাণী থেমে থাকেননি। ২০০৩ সালে একই কলেজ থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। রাণীর এ কৃতিত্বের পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান রাখেন তার মা লুৎফা বেগম। তিনি লেখাপড়ার ক্ষেত্রে রাণীকে সব ধরনের সহযোগিতা করতেন এবং তাকে উৎসাহ যোগাতেন।

স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর ২০০৩ সালে পারিবারিকভাবে মুক্তারপুর গ্রামের জাকির হোসেনের সাথে রাণীর বিয়ে হয়। এরপর তিনি সংসারে মনোযোগী হন এবং শ্বশুর-শ্বাশুড়ীসহ সবাইকে আপন করে নেন। এর পাশাপাশি নানা সামাজিক কাজে রাণী নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

২০১০ সালে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশ নেন। এ প্রশিক্ষণ দু'টি রাণীর চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করে এবং সমাজের অবহেলিত নারীদের উন্নয়নে কাজ করার দৃঢ় সংকল্প নেন। সমাজের নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতে শুরু করেন। গ্রামের নিরক্ষর নারীরা রাণীর কাছে লেখাপড়া শিখতে আসতো। উজ্জীবক প্রশিক্ষণের পর রানী দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বয়স্কদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে নিয়োজিত হন। একইসাথে স্কুলে না যাওয়া শিশুদেরও তিনি বিনা পয়সায় লেখাপড়া শেখান। ধীরে ধীরে রাণী গ্রামের মানুষজন তাকে আপনজন ভাবতে শুরু করে।

নিরক্ষরদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে রাণীর আগ্রহ দেখে ২০০৯ সালে 'স্বনির্ভর-বাংলাদেশ' নামক একটি এনজিও তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। এ সংস্থার সহায়তায় রাণী ৩ বছর মেয়াদী একটি স্কুল গড়ে তোলেন। এ স্কুলে ৩০ জন বাচ্চাকে চিঠিপত্র লেখা ও পড়ার উপযোগী করে গড়ে তোলেন রাণী। স্কুলের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও রাণী থেমে থাকেন

নি, বরং নিজের প্রচেষ্টায় স্কুলের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন। এ সময় ব্র্যাকের সহায়তায় রাণী আবারও পুরোদমে স্কুলের কার্যক্রম শুরু করেন। তার সুদক্ষ পরিচালনার কারণে মুন্সিগঞ্জ সদরের ব্র্যাকের ১২টি স্কুলের মধ্যে তার স্কুলটি প্রথম স্থান অর্জন করে।

লেখাপড়া শেখানোর পাশাপাশি রাণী বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে তিনি সেলাই, ব্লক বাটিকের প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকার ২০ জন নারীকে একই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়া ১৫ জন নারীকে তিনি বিউটি পার্লার পরিচালনা বিষয়ে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তারপুরের ফাতেমা, কহিনুর এবং রিণা পার্লারের কাজ করে স্বচ্ছলভাবে দিনযাপন করছেন।

২০১০ সালের শেষ দিকে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে বৃক্ষরোপণ, টাইপ ও শর্ট হ্যান্ড বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের পর তিনি অন্যদের এসব কাজে উৎসাহ যোগান। তার উৎসাহে পঞ্চসারের বেকার যুবক শামীম একটি কম্পিউটারের দোকান দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

মুক্তারপুরের নারী নেত্রী মহিতুন্নেছার সহযোগিতায় রাণী তার এলাকায় প্রতিবছর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবসসহ প্রায় ১০টি দিবস উদ্‌যাপন করেন। এসব দিবস উদ্‌যাপনে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ, মহিলা অধিদপ্তর ও দুর্বার নেটওয়ার্কের সহযোগিতা নিয়ে থাকেন।

রান্নাবান্না করা এবং খাবার পরিবেশনের আগে এবং টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার বিষয়ে তিনি পঞ্চসার ইউনিয়নে ২০১০ সালে ২০টিরও বেশি কর্মশালার আয়োজন করেন। বাচ্চাদের নখ কাটা এবং ঘরের আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিষয়ে একই এলাকায় তিনি ৫০টির বেশি উঠান বৈঠক করেন। এসব কর্মশালা ও বৈঠকের ফলে ঐসব ক্ষেত্রে এলাকায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

২০১০ সালে রাণী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। এরপর তিনি এসব কাজের প্রসার ঘটানোর জন্য কাজ শুরু করেন। রাণীর উৎসাহে পাশের বাড়ির কালাম একটি গরুর খামার গড়ে তুলেছেন। কালাম বর্তমানে গরুর খামার থেকে তৈরি হওয়া বর্জ্যকে কাজে লাগিয়ে একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্টও বসিয়েছেন।

'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মুক্তারপুরে পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে রাণী ৩০টিরও বেশি কর্মশালা করেছেন। অত্যাচারের শিকার হওয়া নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন তিনি। আবার কখনও কখনও তাদের স্বামীদের পরামর্শ দিয়ে স্ত্রীকে আয়মূলক কাজে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেন। এ ছাড়া ছোট পরিবার গড়ে তোলার জন্য রাণী বিভিন্ন কারখানায় কর্মজীবী মহিলাদের নিয়ে ২০১০ সালে ২০টিরও বেশি কর্মশালা আয়োজন করেন। নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন এবং তাদের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে কাজ করছেন তিনি।

মানুষের সাথে কাজ করার সীমাহীন আগ্রহ থেকেই রাণী নিজেকে সামাজিক কাজে যুক্ত করেছেন। তার কাজকে আরও এগিয়ে নিতে ২০১১ সালে তিনি পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদে প্রার্থী হন। নির্বাচনে বিপুল ভোট পেয়ে তিনি জয়লাভ করেন।

লাভলী আক্তার রাণী এখন আর চার দেয়ালে আবদ্ধ একজন সাধারণ নারী নন, বরং একজন উন্নয়নকর্মী হিসেবে তার বিচরণ এখন সমাজের সর্বত্র। নিরলস প্রচেষ্টায় রাণী নিজে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করেছেন এবং সমাজের নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

জীবনযুদ্ধে হার না মানা টুলু আপার গল্প

এ.জি.এম. আলমগীর

দূরন্ত কৈশোরে যখন মনের ঈশাণ কোণে জমে উঠা স্বপ্নগুলি সবে প্রজাপ্রতির রঙ্গিণ পাখায় ভর করে উড়তে আরম্ভ করে, প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে অনেকটাই বেখাপ্পা মনে হয় এবং দ্রোহের প্রজ্জ্বলনে সবকিছু পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে, ঠিক সে সময়ে বিয়ে নামক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে হয় টুলু আপাকে। শৈশব থেকে বেড়ে উঠা স্বপ্নগুলি যেন বর্ণহীন ধূসর হতে থাকে, ফিকে হয়ে যায় চারপাশ।

১৯৬৪ সালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার হরগজ গ্রামের একটি মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্ম হয় তাজরানা ইয়াসমিন টুলু আপার। কঠোর সামাজিক বিধি-নিষেধের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে তার বেড়ে উঠা। নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯৭৯ সালে মানিকগঞ্জের বেউথা এলাকার মোঃ আরশেদ আলীর সাথে পারিবারিক সিদ্ধান্তে বিয়ে হয় টুলু আপার, শুরু হয় সংসার জীবন। এক বছর পর কিশোরী মায়ের কোল আলো করে জন্ম নেয় একমাত্র সন্তান রিয়াদ। নারীর প্রতি বৈষম্য এবং নারীর পিছিয়ে পড়া ইত্যাদি বিষয়গুলো তাকে ছোটবেলা থেকেই ভাবিয়ে তুলত, স্বামীর সংসারে সে ভাবনাটা আরো গভীর হতে থাকে। জীবনের অভিঘাতে টের পান শিক্ষা ব্যতীত নারীর মুক্তি আসতে পারে না, শত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে হলেও লেখাপড়াটা এগিয়ে নেয়ার বিকল্প নেই। যদিও ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বছর কেটে গেলেও আবার স্কুলমুখী হওয়া এবং হাজারো বাধা অতিক্রম করে মানিকগঞ্জ মডেল গার্লস স্কুল থেকে ১৯৮৫ সালে এস.এস.সি পাশ করেন টুলু আপা। আর ১৯৮৭ সালে দরগ্রাম ভিকু মেমোরিয়াল কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন তিনি। এরপর শিক্ষার আলোতে সমাজকে আলোকিত করার তাগিদ থেকে চাকুরি নেন মানিকগঞ্জের নবারুন শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি নিজ এলাকার নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি। ঠিক এ সময় ঘটে যায় এ মানুষটির জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি। স্কুল কর্তৃপক্ষের আর্থিক অনিয়মের প্রতিবাদ করায় তাকে চাকুরিচ্যুত হতে হয়। নিন্দুকেরা তাকে নিয়ে নানা অপপ্রচার চালায়। তিনি মানসিকভাবে ভীষণ ভেঙ্গে পড়েন, তার চারপাশটা ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেন তিনি।

কিন্তু জীবনের শেষ তলানীতে এসেও মানুষ ঘুরে দাঁড়াতে চায়, ঘুরে দাঁড়ানোর উপলক্ষ খুঁজতে থাকে। এমনই একটা সময়ে জীবনের গতিময়তায় টুলু আপার সাথে পরিচয় হয় 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র তৎকালীন জেলা সম্বন্বয়কারী মুর্শিকুল ইসলাম শিমুলের সাথে। তার অনুপ্রেরণায় ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি অংশ নেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ পরিচালিত ১৯তম 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে। প্রশিক্ষণের প্রতিটি সেশনে ওঠে আসে তার নিজের জীবনের এবং চারপাশে বিরাজমান নারীর সত্যিকারের অবস্থা ও অবস্থান। পিতৃতন্ত্র ও নারীর ক্ষমতায়নের সেশনটি তার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি আন্দোলিত হন এবং তার চিন্তার জগতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এরই মধ্যে ২০০৮ সালের জানুয়ারিতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের পরিচালনায় ১২৯২তম ব্যাচের উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এ প্রশিক্ষণগুলি তাকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ সরবরাহ করে, তিনি খুঁজে পান প্রতিবাদের শক্তি।

‘প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রম’ শীর্ষক কর্মশালার মধ্যে দিয়ে তিনি জনগণকে সংগঠিত করেন। বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নিরক্ষরতা দূর করার জন্য পাড়ায় আলোচনা সভা, উঠান বৈঠক শুরু করেন। তাঁর এই কর্মকান্ড এলাকার মানুষের ভিতর আলোচনার সূত্রপাত করে। কেউ কেউ সমালোচনা করে আবার অনেককেই প্রশংসা করে তাকে উৎসাহ যোগান। নানা সমস্যা তাঁর চলার পথকে থামিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তাঁর ভিতরের মানুষটি অদম্য। কোন বাঁধাই তার চলার পথ রুদ্ধ করতে পারে না। এলাকার রুগ্ন চেহারাটা বদলানোর জন্য তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন। সমাজের যেখানেই সংকট সেখানেই টুলু আপা। তাঁর এই নিরলস চেষ্টায় এলাকার চিরচেনা চেহারা ধীরে ধীরে বদলাতেও আরম্ভ করে।

এবার তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষের চাকুরিচ্যুতির স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনী লড়াই শুরু করেন। কিন্তু আমাদের সমাজের স্কুলগুলোর কাঠামোতে সাধারণত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যুক্ত থাকেন এবং তাদের রক্ষার জন্য প্রশাসনেরও এক ধরনের পরোক্ষ চেষ্টা থাকে। এ কারণে টুলু আপার জন্য এ লড়াইটা কঠিন লড়াই হয়ে দাড়ায়। কিন্তু তিনি তো হার মানার নন। লড়াই চালিয়ে যান। দীর্ঘ ৪ বছরের লড়াইয়ে তিনি এতে জয় লাভ করেন।

নতুন সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন টুলু আপা। এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীদের সংগঠিত করে তাদের নিত্য দিনকার সমস্যা সমাধানের জন্য গড়ে তোলেন ’জাগরণ’ নামের একটি সমিতি। দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা এবং দুস্থ অসহায় নারীদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরিতে এ সমিতি থেকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। নানান ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে ব্যস্ত থাকায় টুলু আপা এখন শুধু এলাকার পরিচিত মুখই নন তাঁর অবস্থানেরও পরিবর্তন হয়েছে। তিনি এখন মানিকগঞ্জ জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা মহিলা সংস্থার নির্বাহী সদস্য। এ ছাড়াও তিনি ২০১২ সালে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক মানিকগঞ্জ জেলার সভাপতি নির্বাচিত হন। টুলু আপা সম্প্রতি তার প্রত্যাশিত পুরোনো পেশা শিক্ষকতায় ফিরে গিয়ে এস এ প্রি-ক্যাডেট স্কুলে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। টুলু আপা তার লেখা-পড়াকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার তাগিদ থেকে স্নাতক প্রথম পর্ব পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁর প্রেরণায় স্থানীয় নারীরা এখন স্বপ্ন দেখতে সাহস পাচ্ছে।

চায়না মন্ডলঃ দারিদ্র্য যার কাছে পরাজিত

খোরশেদ আলম

অভাবের কারণে পরীক্ষার ফরম পূরণের টাকা দিতে না পারায় যার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, তিনি এখন নিজের চেষ্টায় এমএ পড়ছেন। সেই সাথে বিপুল সংখ্যক নারীকে ভালভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। যশোরের মনিরামপুর উপজেলার চায়না মন্ডলের কথা বলা হচ্ছে। চায়না মন্ডলের জীবন-সংগ্রাম আজ অনেকের জন্যই অনুপ্রেরণার।

জেলা সদর হতে ৪০ কিলোমিটার এবং উপজেলা সদর হতে ২০ কিলোমিটার দূরের প্রত্যন্ত গ্রাম ভবানীপুর। ১৯৮৪ সালে এ গ্রামের সুজন মন্ডল এবং শোভা মন্ডলের ঘরে জন্ম চায়না মন্ডলের। চার বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। বাবার সম্পত্তি বলতে বসতবাড়ি আর এক বিঘা আবাদী জমি। কিন্তু ভবদহ জলাবদ্ধতার মধ্যে হওয়ায় আবাদী জমি থেকে নিয়মিত ফসল ফলানো যেত না। সংসারের আয় বলতে ছিল বাবার শ্যালো মেশিন মেরামতের কাজ। তাও সেচ মৌসুমের ৪ মাস ছাড়া অন্য সময় বেকার থাকতে হতো চায়নার বাবাকে। কারণ শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অন্য কোন কাজ করতে পারতেন না তিনি।

ছোটবেলা থেকেই মাকে দেখছেন অনেক কষ্টে সংসার চালাতে। দারিদ্র্যের কারণেই তার বড় দুই বোনের লেখাপড়া বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় মাত্র তের বছর বয়সেই তার বড় বোনের বিয়ে হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় বোনের বিয়ে হয় দশম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায়। ছোটবেলায় পরিবারের এসব দুঃখ-কষ্ট তাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। সংগ্রাম করে ভালভাবে বাঁচার জন্য তাগিদ অনুভব করেন চায়না মন্ডল।

আর্থিক অভাবের কারণে বড় দুই বোনের লেখাপড়া থেমে গেলেও হার মানেন নি চায়না মন্ডল। শত প্রতিকূলতার মাঝেও চালিয়ে যেতে থাকেন নিজের লেখাপড়া। বাড়ি থেকে যতটুকু সহায়তা পেয়েছেন সেটুকুই কাজে লাগিয়েছেন। এভাবেই এগিয়ে চলছিল তার লেখাপড়া। কিন্তু বড় রকম বাঁধার মুখে পড়লেন এস.এস.সি পরীক্ষা দেয়ার আগে। স্কুল কর্তৃপক্ষ পরিবারের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে চায়না মন্ডলকে ফরম পূরণের জন্য শুধুমাত্র শিক্ষাবোর্ডের ফি বাবদ ৭শ' টাকা পরিশোধ করতে বলেন। কিন্তু নির্ধারিত দিন পর্যন্ত এই ৭শ' টাকাই তার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। এ সময় লেখাপড়ার প্রতি তার আগ্রহ দেখে এগিয়ে আসেন প্রতিবেশী এক চাচা।

২০০০ সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করে চায়না মন্ডল মশিহাটি ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হন। এ কলেজ থেকেই তিনি এইচ.এস.সি পাশ করেন। কিন্তু পরিবারের আর্থিক দুরাবস্থার কারণে এইচ.এস.সি পাশ করার পর তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ভেঙ্গে পড়েননি চায়না মন্ডল। নিজে উপার্জন করে আবারও লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজতে থাকেন। এ সময় স্থানীয় উজ্জীবক বিউটি সরকারের আমন্ত্রণে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র ৪৬৪তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণটি তাকে নতুনভাবে সাহস যোগায়। আত্মশক্তি, আত্মনির্ভরশীলতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা তার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়। নিজের স্বপ্নপূরণে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন চায়না মন্ডল।

নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং লেখাপড়া শেষ করার অসীম আগ্রহ নিয়ে নতুন করে শুরু করেন জীবন সংগ্রাম। নিজের কাছে সঞ্চিত ১শ' টাকা, মার কাছে নেয়া ৫শ' টাকা এবং প্রতিবেশীর এক বৌদির কাছ থেকে ১ হাজার টাকা ধার নিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। সেলাইয়ের কাজ করে প্রতি মাসে ৫শ' থেকে ১ হাজার টাকা আয় করতে থাকেন। এরমধ্য দিয়েই তার শিক্ষাজীবনের অচল চাকা সচল হয়। মশিহাটী ডিগ্রী কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ. পাশ করেন। বর্তমানে তিনি এম.এ. পড়ছেন।

টাকার অভাবে যার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল সেই চায়না মন্ডল এখন পরিবারের কান্ডারী। বর্তমানে তিনি সেলাই কাজ করে প্রতিমাসে প্রায় ৫ হাজার টাকা আয় করছেন। তার ছোট বোনকেও সেলাইয়ের কাজ শিখিয়েছেন তিনি। সে এখন চায়না মন্ডলকে কাজে সহায়তা করে।

চায়না মন্ডল তার নিজের কাজের মাধ্যমে পরিবারের অভাব ঘুছিয়েছেন। আগে তার মাকে বিশুদ্ধ পানির জন্য অনেক কষ্ট করতে হতো। এজন্য গত বছর সাত হাজার টাকা খরচ করে বাড়িতে একটি নলকূপ বসিয়েছেন, কিনেছেন বাড়ির আসবাবপত্রও।

নিজের অর্জিত টাকায় এসব করতে পেরে বেড়েছে চায়না মন্ডলের আত্মবিশ্বাস। পরিবার ও প্রতিবেশীদের কাছেও মর্যাদা বেড়েছে তার। বাবা-মা তাকে নিয়ে এখন গর্ববোধ করেন।

পরিবারকে সহায়তা করার পাশাপাশি চায়না মন্ডল প্রতিমাসে কিছু টাকা সঞ্চয় করা শুরু করেন। বর্তমানে এই সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮০ হাজার টাকা। সেলাইয়ের পাশাপাশি ছোট পরিসরে নিজ বাড়িতেই কিছু সিট কাপড় বিক্রি করছেন তিনি। বিক্রিও হচ্ছে বেশ। সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে ভবিষ্যতে একটি কাপড়ের দোকান দেয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন চায়না মন্ডল।

বর্তমানে তাদের পরিবারে আর অভাব নেই। তারা দুই বোন এবং বাবা তিনজনই উপার্জন করছেন। শ্যালো মেশিনের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় তার বাবাও এখন মেশিন মেরামতের কাজ পান। শুধু নিজের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত নন চায়না মন্ডল। গ্রামের নারীদের নিয়ে উঠান বৈঠক ও আলোচনা সভার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সচেতন করতে থাকেন। এছাড়া মেয়েদের বাল্যবিবাহ বন্ধ, সন্তানদের নিয়মিত স্কুলে পাঠানো, যৌতুক ও নারী নির্যাতন বন্ধ, স্যানিটেশন সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে চলেছেন চায়না মন্ডল।

এ সকল কাজে আরও সফলতা আনতে স্থানীয়দের নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'আলোর দিশারী মহিলা সমিতি'। গ্রামের ৬০ জন নারীকে নিয়ে ২০০৬ সালের জুলাই মাসে এই সমিতি যাত্রা শুরু করে। সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পাশাপাশি এখানে প্রতি মাসে দশ টাকা সঞ্চয় করেন। বর্তমানে আলোর দিশারী মহিলা সমিতির সদস্য সংখ্যা ১শ' জন এবং সঞ্চয় দু'লক্ষ টাকারও বেশি। সঞ্চিত অর্থ থেকে সদস্যরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন আয়মুখী কাজে লাগাচ্ছেন। ইতোমধ্যে এ সমিতির প্রায় ৭০ জন সদস্য আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন। চায়না মন্ডল শুরু থেকেই এ সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

চায়না মন্ডল পরবর্তীতে ২০০৯ সালে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। তিন দিনব্যাপী এই ফাউন্ডেশন কোর্স এবং পরবর্তিতে মাসিক ফলোআপ প্রশিক্ষণগুলো তাকে নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীদের বঞ্চনার বিষয়টি তাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। এই শঙ্খল ভাঙ্গার জন্য আরও কাজ করার জন্য তিনি এ প্রশিক্ষণ থেকে অনুপ্রেরণা পান।

উজ্জীবক হিসেবে সমাজের জন্য যে সকল কাজ করে আসছিলেন এই প্রশিক্ষণের পর তার পরিসর আরও বেড়ে যায়। অসহায় নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১০ সালে ৫০ জন নারীকে গড়ে তোলেন ভবানীপুর মহিলা সমবায় সমিতি। বর্তমানে

এই সমিতির মোট সঞ্চয় ৪৫ হাজার টাকা। সদস্যরা এখান থেকে ঋণ নিয়ে মুরগীর খামার, গরু-ছাগল পালন ও সেলাই মেশিন কিনে দর্জির কাজ করছেন। প্রায় ২৫ জন নারী প্রতিমাসে আয় করছেন ১ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত। চায়না মন্ডলের সমিতি দু'টিকে কেন্দ্র করে দেড়শ' নারী নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখছেন।

সামাজিক ঋণ শোধ করার মানসিকতা থেকে চায়না মন্ডল নিজের পাড়ায় একটি গণশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। ২০১২ সালে শুরু করা এই গণশিক্ষা কেন্দ্রে ২৫ জন নারী লেখাপড়া শিখছেন। এই কেন্দ্রের প্রথম ব্যাচটির স্বাক্ষরতা অর্জন এখন শেষ পর্যায়ে। গ্রামের নিরক্ষর নারীদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে এই কেন্দ্রটি চলমান রাখতে চান তিনি। আর্থিক সংকটের কারণে তার মতো কারো যেন পড়ালেখা বন্ধ না হয়, সে লক্ষ্যেই তিনি কাজ করতে চান।

লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করার পরিবর্তে ব্যবসা করতে চান চায়না মন্ডল। গড়ে তুলতে চান একটি মিনি গার্মেন্টস (কারখানা); যেখানে কমপক্ষে ২শ' নারীর কর্মসংস্থান হবে। তার বিশ্বাস, নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলে নির্যাতনের শিকার হবে না এবং সুযোগ পাবে বিকশিত হওয়ার। অবদান রাখতে পারবে সমাজ ও রাষ্ট্রে।

অনুসরণীয়, সফল একজন নারী খুলনার বিউটি মুখার্জী

শারমীন আক্তার

সংগ্রামী জীবনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বিউটি মুখার্জী। জীবন চলার পথে নানান বাধা-প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে তিনি অর্জন করেছেন সামাজিক পরিচিতি, সংসারে নিয়ে এসেছেন আর্থিক স্বচ্ছলতা।

বিউটির জন্ম বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট উপজেলার চুনখোলা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে। বাবা সুশীল মুখার্জী ছিলেন একজন প্রতিবন্ধী মানুষ। টিউশনি করে কোনোরকমে সংসার চালাতেন তিনি। এ ছাড়া সংসারে ছিলেন মা রেখা মুখার্জী ও একমাত্র ছোট ভাই। রাস্তার ধারে অন্যের জায়গায় তোলা ঘরেই ছিলো বিউটিদের বসবাস। সেখানেই কাটে বিউটির কৈশোর।

বিউটির শিক্ষাজীবন শুরু হয় চকরাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এ স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করেন তিনি। এ সময় জমির মালিক তাদের বাড়ির জায়গাটি বিক্রি করে দেন। এতে বাধ্য হয়েই চুনখোলা ছাড়তে হয় তাদের। বিউটিদের ঠাঁই হয় খুলনার জলমায়। মামার বাড়ির এক কোণে ঘর তুলে শুরু হয় তাদের বসবাস। এ সময় বাবার টিউশনির টাকা আর মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে যা রোজগার করতো তা দিয়েই তাদের সংসার চলতে থাকে। কিন্তু বিউটির বাবা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ায় দূর্ভোগের ঘনঘটায় নিমজ্জিত হয় বিউটিদের সংসার। এ সময় বিভিন্নজনের সাহায্য নিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যান বিউটি। সালে বটিয়াঘাটা গার্লস স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এস.এস.সি পাশ করেন তিনি। বিউটির পড়ালেখায় সহায়তা করতে এগিয়ে আসে স্থানীয় কিছু মানুষ। তারা একটি তহবিল গঠন করে বিউটির কলেজে ভর্তি, বই কেনা এবং কলেজে তার বেতন ফ্রি করে দেয়ার ব্যবস্থা করে করেন। কিন্তু বাবার অসুস্থতার কারণে ছোট ভাইয়ের পড়াশুনাসহ সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব এসে পড়ে বিউটির ওপর। সারাদিন একের পর এক টিউশনি করে সংসারের সব খরচ নির্বাহ করতে হতো তাকে। এ সময় নিজের পড়াশুনা করার কোন সময়ই পেতেন না বিউটি। যে কারণে তিনি এইচ.এস.সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। এতে অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েন বিউটি। এদিকে মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন বাবা সুশীল মুখার্জী। মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র ঠিকও করে ফেলেন তিনি। পাত্রের বাড়ি মংলাতে। তিন ভাইয়ের মধ্যে ছোট। পেশায় পুরোহিত। নাম সুশান্ত চক্রবর্তী।

বিয়ের পর বিউটি আবারও এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিতে চাইলেন। বিউটির স্বামীও এ ব্যাপারে তাকে উৎসাহ যোগালেন। কিন্তু বিধি বাম! সংসারযন্ত্রের সব ঝামেলার মাঝে পরীক্ষা দেয়ায় এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না বিউটি। বিয়ের তিন বছর পর তার কোলজুড়ে এলো একটি পুত্র সন্তান শুভ চক্রবর্তী। কিন্তু স্বস্তির নি:শ্বাস নিতে পারলেন না তিনি। দুঃখের করাল গ্রাসে নিপতিত হলেন বিউটি। ছেলের বয়স যখন চার বছর তখন বিউটির স্বামী আক্রান্ত হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে। দীর্ঘদিন দেশে চিকিৎসা করিয়ে কোন নিরাময় না পেয়ে ভারতের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তার স্বামীকে। এক বছর অসুস্থতায় ভোগার পর মারা যান বিউটির স্বামী।

একদিকে স্বামী হারানোর বেদনা, আর বিয়ে করে ছোট ভাইয়ের সংসার থেকে আলাদা হয়ে পড়া; সব মিলিয়ে বিউটি কূল-কিনারাহীন হয়ে পড়েন। তদুপরি মাকে দেখাশুনার দায়িত্বও পড়ে তার কাঁধে। এ অবস্থায় এলাকায় মন্দিরভিত্তিক শিশুশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের পড়ানোর দায়িত্ব পান বিউটি। এখান থেকে পাওয়া মাত্র ৬'শ টাকা বেতন দিয়ে কোনোরকমে সংসার চালাতে থাকেন তিনি। কিন্তু এভাবে তো আর সংসার চলে না।

নিজেকে আরও বিকশিত করতে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নেয়া বিউটি বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের আওতায় ২০০৭ সালে একটি ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশ নেন। প্রশিক্ষণ নেয়ার পর গ্রামে এসে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি জড়িত হন বিভিন্ন সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থার সাথে। কিছুদিন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার পর ২০১১ সালে 'সুশীলন' নামে একটি এনজিওতে জিএমই হিসেবে নিয়োগ পান। ২ বছরের কম বয়সী সকল শিশুস্বাস্থ্য এবং গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করাই ছিলো তার কাজ। এছাড়া স্থানীয় এনজিও জাগ্রত যুব সংঘের চেঞ্জমেকার কমিটির সদস্য হিসেবেও কাজ করছেন বিউটি। এই কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি এলাকার হত-দরিদ্রদের ভিজিএফ কার্ড, বিধবা ভাতা এবং বয়স্ক ভাতা পেতে সহযোগিতা করেন।

একইসাথে বনফুলের 'লোকমচা কমিটি'র সদস্য হিসেবে তিনি বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক প্রথা বন্ধ এবং শিশুশ্রম রোধে কাজ করে যাচ্ছেন। এ ছাড়া ব্র্যাক-এর স্বাস্থ্য সেবিকা হিসেবে এলাকার কারও যক্ষার লক্ষণ দেখা দিলে তার কফ পরীক্ষা ও নিয়মিত ঔষধ খাওয়ানোর কাজে সহযোগিতা করেন।

কঠোর পরিশ্রম আর দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণে বিউটি এখন তার মা ও ছেলেকে নিয়ে স্বচ্ছল জীবন যাপন করছেন। একই সাথে অর্জন করেছেন সামাজিক পরিচিতি এবং স্বীকৃতি। গ্রামের লোকজন তার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নেয়ার জন্য আসে। এমনকি গ্রামের সালিশগুলোতে ডাকা হয় বিউটি মুখার্জীকে।

তার এই স্বচ্ছলতা ও সামাজিক পরিচিতির পেছনে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র ভূমিকাকেই বড় করে দেখেন বিউটি। কারণ, বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সদস্য হওয়ার পর থেকেই তার সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসাথে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে কাজ করার সুযোগও তৈরি হয়েছে। কিন্তু আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক পরিচিতি পেয়ে বিউটি বসে নেই। কোন কাজকেই তিনি 'ছোট' করে দেখেন না। এখনও ফসলের মাঠে গিয়ে ধান কাটেন। স্থানীয় নারীদের সংগঠিত করে এলাকার খাল বর্গা নিয়ে মাছ চাষ করেন তিনি।

আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি সামাজিক সেবা ও স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রসার বিষয়ক কাজেও সহায়তা করে চলেছেন। এলাকায় একটি লাইব্রেরী স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থানীয় তরুণদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিউটি। এ ছাড়া তিনি গণশিক্ষা কার্যক্রমেও সহযোগিতা করছেন। তিনি নিজে ১৫ জন ঝরে পড়া শিশুকে আবার পড়াশুনায় ফিরিয়ে এনেছেন। এলাকায় যেখানেই কোনো সেবামূলক কাজ, সেখানেই বিউটি আছেন। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তিনি স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে তুলছেন পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ২৫ জনকে তিনি অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তুলেছেন। এ বছর তিনি ২৫ জন শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করেছেন। এ ছাড়া তিনি তার এলাকায় হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন ও জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করতেও কাজ করছেন।

এ সকল কাজের মধ্য দিয়েই ২০১৩ সালে তিনি জলমা ইউনিয়ন বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। বিউটি মুখার্জী এখন এলাকার অসহায় মানুষের আপনজন। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি পেয়েছেন এই সাফল্য। এখন তার স্বপ্ন একমাত্র ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করা আর দুস্থ, অসহায় মানুষের সেবায় কাজ করে যাওয়া। তিনি তার সেবামূলক কাজের মাধ্যমে জায়গা করে নিতে চান মানুষের মনের মনিকোঠায়।

সমাজ বদলের কারিগর রাফিজার গল্প

কাজী ফাতেমা বর্ণালী ও মোঃ গিয়াসউদ্দিন

বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষা জেলা সাতক্ষীরা। উত্তর রঘুনাথপুর- এই জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের একটি গ্রাম। এ গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে ১৯৮৭ সালে আরশাদ আলী ও সুফিয়া খাতুনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন রাফিজা। ভৌগলিক কারণে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে দিন কাটাতে হয় এই এলাকার মানুষদের। তাই সবাই পুত্র সন্তান আশা করে। তাই রাফিজার আগমনে খুশী হতে পারেননি আরশাদ আলীর পরিবারের কেউই। রাফিজা জন্ম নেয়ার পর আপনারা নাকি খুশী ছিলেন না? এই প্রশ্নটা ছুড়ে দিতেই তার বাবার স্বলজ্জ্ব উত্তর, 'ওটাতো অনেক পুরানো দিনের কথা'। এখন কি খুশী? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এ কথা বলে কেন আমাদের লজ্জা দিচ্ছেন। এখন রাফিজাকে না দেখলে আমাদের একদিনও চলে না।' বেশ ধাক্কা লাগলো কথাটা শুনে। রাফিজা কি এমন করেছে যে এতবড় প্রচলিত একটি বিশ্বাসকে ভেঙ্গে দিতে পেরেছে?

পিতা-মাতার পাঁচ সন্তানের মাঝে রাফিজা তৃতীয়। ছোটবেলা থেকেই রাফিজা ছিলেন একটু দুষ্ট প্রকৃতির হলেও লেখাপড়ায় ছিলেন বেশ ভালো। ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়ে সে রাফিজা তার প্রমাণও রাখে। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বড় দুই বোনকে বিয়ে দিতে গিয়ে রাফিজার বাবা ঋণগ্রস্থ হয়ে যান। পাঁচ শতক বসতভিটা ছাড়া তাদের কোন কৃষি জমি ছিল না। স্থানীয় বালিয়াডাঙ্গা বাজারে একটি ছোট মুদির দোকানের আয় দিয়েই চলছিল তাদের সংসার। এর পাশাপাশি অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে সামান্য কিছু আয় করতেন বাবা আরশাদ আলী।

এরই মধ্যেই অভাবের কারণে স্বামীর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে বাবার পরিবারে ফিরে আসে রাফিজার মেজ বোন। যৌতুকের টাকা না দিতে পারায় স্বামীর বাড়ির লোকজন তাকে নির্যাতন করতো। এ ঘটনা রাফিজার মনকে বিদ্রোহী করে তোলে। এ অবস্থায় সংসারের অভাব কাটিয়ে উঠার জন্য কিছু একটা করার চিন্তা করতে থাকেন রাফিজা। এজন্য ওই সময় তার বিয়ের আয়োজন না করতে বাবাকে অনুরোধ করেন। বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন- মেয়েরা সমাজের বোঝা নয়, সুযোগ পেলে তারা অনেক কিছু করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র উজ্জীবক ও নারীনেত্রী রেহেনা আপার কথা বলেন। রাফিজা তার বাবাকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, রেহেনা আপা তার পিতা- মাতার সংসার চালানোসহ ইউনিয়নের একজন সফল নারী হিসাবে পরিচিতি পেয়েছেন। তিনি পারলে সে কেন পারবে না? রাফিজার যুক্তির সাথে একমত পোষণ করে তার বাবা তিন বছর সময় দেন তার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য। আর এখান থেকেই শুরু হয় রাফিজার জীবনের নতুন পথচলা।

এরপর থেকে রাফিজা নিয়মিতভাবে নারীনেত্রী রেহানার সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন। এরমধ্যে রেহানা একদিন রাফিজাকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার আমন্ত্রণ জানান। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাফিজা ১৮৯১তম ব্যাচের উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী অধিকারসহ রাফিজা অনেক অজানা বিষয়ে অবগত হন।

এরপর তিনি এস.এস.সিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে মানপুর কলেজে ভর্তি হন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণের তিন মাস পর রাফিজা সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ সময় পড়ালেখার পাশাপাশি তিনি বাড়িতে বসেই সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। সেলাইয়ের কাজ করে প্রতিমাসে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা আয় করতে থাকেন। এরপর কিছু দিন রাফিজা নিজ বসতবাড়িতে সবজি চাষের ওপর একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের পর তাদের বসতবাড়িতে থাকার ঘর ছাড়া বাকী পতিত জায়গায় বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করতে থাকেন। নিজেদের চাহিদা পূরণ হওয়ার পাশাপাশি সবজি বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা উপার্জন হতে থাকে।

সময় এগিয়ে যেতে থাকে। রাফিজা এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শ্যামনগর কলেজে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হন। এ সময়ই তিনি একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেন; যেখানে তার বাবা-মাসহ স্থানীয় অনেক বয়স্ক নারী-পুরুষ শিক্ষাগ্রহণ করে। ধীরে ধীরে রাফিজা আরও অনেক সামাজিক কাজের সাথে জড়িত হতে থাকেন।

এর মাঝে রাফিজার জীবনে আরো একটি বড় সুযোগ তৈরি হয়। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, নারী নির্যাতনের কারণ ও নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে তার সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। রাফিজার ভিতরে জেগে উঠে শ্বাসত এক নারী সত্ত্বা।

নারীনেত্রী হিসেবে রাফিজা ইতিমধ্যেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছেন। ধাত্রী প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকার গর্ভবতী মায়েদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তিনি। স্থানীয় নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার অংশ হিসেবে তিনি তাদের নিয়ে উঠান বৈঠক, ক্যাম্পেইন ও বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করে চলেছেন। এর পাশাপাশি তিনি বেশ কয়েকজন নারীকে সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ৪ জন গরিব নারী সেলাইয়ের কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

সমাজে নারীদের উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে রাফিজা 'নারী মুক্তি' নামের একটি সংস্থা গড়ে তুলেছেন। এর সাথে যুক্ত হয়ে প্রায় ২৫ জন নারী বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। সমাজে বাল্যবিবাহ বন্ধে গ্রামের মা ও মেয়েদের সচেতন করা, যৌতুক এবং নারী ও শিশু পাচার রোধে সভা-সেমিনার আয়োজন এবং বিভিন্ন দিবস পালনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে এ সমিতি।

লেখাপড়া শেষ করে রাফিজা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হতে চান। শিক্ষিকা হয়ে কন্যাশিশুদের নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলতে চান তিনি। ভবিষ্যতে কন্যাশিশুরা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ায় অংশ নেবে এমন স্বপ্নও দেখেন তিনি। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতেই দৃঢ়তার সাথে কাজ করে চলেছেন রাফিজা।

ক্ষুধামুক্ত সমাজ বিনির্মাণের একনিষ্ঠ কর্মী তাছলী

মাসুদুর রহমান রনজু

বাগেরহাট শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে ষাট গম্বুজ ইউনিয়নের একটি গ্রাম বারুইডাঙ্গা। দিগন্ত বিস্তৃত শশিখালী বিলের পাশ ঘিরেই অবস্থান এ নিভৃত গ্রামটির। এ গ্রামের এক হতদরিদ্র পরিবারে তাছলির জন্ম হয় ১৯৭৬ সালের ১০ এপ্রিল।

পরিবারে তিন বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে তাছলি সবার বড়। গায়ের রং কালো এবং কন্যাশিশু হওয়ায় তার শৈশব কেটেছে অনেকটাই অনাদর আর অবহেলার মধ্য দিয়ে। শৈশবের স্মৃতিগুলো তাছলির চোখে এখনও জ্বলজ্বল করে। বিশেষ করে তার প্রতি অন্যদের অবহেলার কথা। অন্যদের মতো কোন বায়না করলে বিনিময়ে জুটতো কঠিন শাসন আর ভৎসনা। এমন পরিস্থিতিতেই পাটরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয় তাছলির শিক্ষাজীবন।

লেখাপড়ায় বরাবরই মনোযোগী ছিলেন তাছলি। প্রতিটি শ্রেণীতে প্রথম স্থান ছিলো তার দখলে। কৃতিত্বের সাথে প্রাইমারি শেষ করে তিনি ভর্তি হন খানজাহানিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এ স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এস.এস.সি. পাশ করেন তাছলি। তাছলির তখন অনেক স্বপ্ন, সে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। উচ্চ পদে সরকারি চাকরি করবে, সংসার থেকে দূর করবে দুঃখ-কষ্ট আর দারিদ্র্য। কিন্তু পরিবারের সদস্যরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাকে বিয়ের দেয়ার জন্য। এরমধ্যে অষ্টম শ্রেণী পাশ এক ছেলের সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু বিয়েতে তাছলি রাজি না হওয়ায় তার পরিবার আর সামনে এগোয়নি।

এ সময় টিউশনি করা টাকা দিয়ে বাগেরহাট সরকারি পিসি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হন তাছলি। বাড়ি থেকে কলেজ অনেক দূরে, তাই পায়ে হেঁটে তাকে খেয়ে না খেয়েই কলেজে যেতে হয়েছে। এরকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই ১৯৯৫ সালে তাছলি দ্বিতীয় বিভাগে এইচ.এস.সি পাশ করে। তাছলির বিয়ের জন্য আবারও পরিবারে শুরু হয় তোড়জোড়। অবশেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পিওন সিরাজুলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের দেড় বছরের মাথায় তাছলির কোলজুড়ে আসে কন্যাসন্তান মাহবুবা তাছলি ঊর্মী। এরপর তাছলির জীবনে নেমে আসে বিভীষিকা। স্বামী-শ্বশুর-শ্বাশুড়ী সবাই মিলে তাকে যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকে। শুরু হয় নির্যাতন। এক পর্যায়ে উপায় না দেখে কন্যাশিশুসহ তাছলি ফিরে আসেন বাবার বাড়িতে।

হত দরিদ্র বাবার আর্থিক অবস্থা তখন ভীষণ খারাপ। তাছলির চোখ যেন দৃষ্টিহীন হয়ে যায়। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য তাকে কিছু একটা করতেই হবে। একটি কাজের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরাঘুরি করতে শুরু করেন তিনি। কিন্তু বিনিময়ে মিলে শুধুই প্রত্যাখান আর হতাশা। এ সময় কয়েকটি ছাত্রকে পড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়। এর বিনিময়ে পাওয়া সামান্য অর্থ দিয়েই কোনরকমভাবে সংসার চালাতে থাকেন।

এ সময় তাছলির জীবনে আশার আলো হয়ে আসে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। পাশের গ্রামের উজ্জীবক যমুনার ডাকে সাড়া দিয়ে ২০০৮ সালে ১৫৫১তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণের পর

তাছলির উপলব্ধি আর চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তনের মাত্রা যুক্ত হয়। তাছলি বুঝতে পারেন- আত্মশক্তিই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়ার মূল পুঁজি।

প্রশিক্ষণ শেষে গ্রামে ফিরে তার মতো কিছু হতদরিদ্র নারীদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'ডাহুক মহিলা সঞ্চয় সমিতি'। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনেকে এটাকে ভাল চোখে না দেখলেও তাছলি তার কর্মে অনঢ় থাকেন। ২৫ জন নারীকে যুক্ত করেন ডাহুকের সাথে। পাশ্ববর্তী কেয়া ভাবীদের বাড়িতে নিয়মিতভাবে সমিতির সাপ্তাহিক সভা আয়োজন করতেন তাছলি। এসব সভায় যৌতুক ও বাল্যবিবাহ বন্ধ, গর্ভবতী নারীদের পরিচর্যা এবং প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং সে অনুযায়ী তারা কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

২০০৮ সালে গড়ে ওঠা সমিতি এখন বলা চলে একটি পরিপূর্ণ সংগঠন। বর্তমানে এ সমিতির সঞ্চয়ের পরিমাণ ১ লাখ টাকার ওপরে। দরিদ্র নারীদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে এ সমিতি এলাকায় বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ সমিতি থেকে অসহায় নারীদেরকে ছাগল পালন, সেলাই মেশিন ক্রয়, মৎস্য চাষ এবং সবজি চাষের জন্য ঋণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া সমিতির ৫০ জন সদস্যের প্রত্যেকেই বিভিন্ন আয়মুখি কার্যক্রমের মাধ্যমে মাসে প্রায় ২ হাজার টাকা আয় করছেন। ডাহুকের কার্যক্রম, পরিচিতি এবং সুনাম এখন পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামেও বিস্তৃতি লাভ করেছে। তাছলির পরামর্শ ও সহযোগিতায় পার্শ্ববর্তী পশ্চিম ডাঙ্গা গ্রামে গড়ে ওঠেছে চন্দনা, জবা, মধুমতি নামে আরও ৩টি সংগঠন। এছাড়া তার গ্রামের পূর্বপাড়ায় ময়না নামের ২৫ সদস্য বিশিষ্ঠ আরও একটি নারী সংগঠন গড়ে ওঠেছে; যার উপদেষ্টা হিসেবে তাছলি কাজ করছেন।

গত ৬ মাস থেকে ডাহুক মহিলা সমিতি 'কন্যাশিশু শিক্ষা ফান্ড' নামে একটি তহবিল চালু করেছে। প্রতিদিন রান্নার সময় জমা করা এক মুঠো চাল সপ্তাহের সভার দিন নিয়ে আসেন নারীরা। ডিসেম্বর ২০১২ সালে একত্র করা এসব চাল বিক্রি করে এ ফান্ডে মোট ১১ হাজার টাকা জমা হয়েছে। এ জমাকৃত টাকা তাদের কন্যাশিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় করার অঙ্গীকার করেন সমিতির সদস্যরা।

এর মধ্যে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ৮৩তম ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন তাছলিসহ তার ইউনিয়নের ১৮ জন নারী। এরপর তাছলি প্রতিমাসে ফলোআপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেন। এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীদের সংগঠিত করে স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি ব্যবহার, জন্ম নিবন্ধন ও শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং জমিতে জৈবসার প্রয়োগসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

২০১২ সালে ষাট গম্বুজ ইউনিয়ন পরিষদে স্থানীয় নারী নেত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ইউনিয়ন কমিটি। তাছলি বেগম এ কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া বেইস বাংলাদেশ ও গণবিদ্যালয় নামের দু'টি সংস্থায় তাছলি নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন।

জুন ২০১২ সালে তাছলি পাটরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্যপদ পেয়েছেন। এ সকল দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা পেয়েছেন তিনি। সম্প্রতি গণবিদ্যালয় তাকে গণউন্নয়ন নামক কার্যক্রমে ৫ হাজার টাকা মাসিক বেতনে একটি চাকরি দিয়েছে।
দিনে দিনে তাছলির মেয়ে ঊর্মীও বড় হয়েছে। মায়ের আদর স্নেহ আর যত্নে গত বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেছে। তাছলি তার মেয়েকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান।

তাছলির নেতৃত্ব ও কর্ম-উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এলাকার অনেক বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারী যেমন- তহুরা, মর্জিনা ও ময়না বেগমরা এখন স্বপ্ন দেখেন নতুন দিনের। সাহস পান সম্ভাবনার পথে এগিয়ে চলার।

তাছলির নেতৃত্বে ষাট গম্বুজ ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে নারী সংগঠন গড়ে উঠেছে; যেখানে নারীরা ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনায় তাদের কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে পারছেন। তাছলিকে ইউনিয়নের বেশিরভাগ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয় এবং দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

তাছলি এখন ভীষণ ব্যস্ত। পুরো গ্রাম তথা পুরো ইউনিয়নই তার পরিবার ও কর্মক্ষেত্র। অবহেলিত নারীদের নিরক্ষরমুক্ত ও আয়ক্ষম করে তোলা, মা ও শিশুর মৃত্যু হ্রাস এবং ইউনিয়ন পরিষদকে আরও কার্যকরী করে তোলার জন্য নিত্যদিন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি। আর এসব কাজই করছেন ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রত্যয়ে।

আত্মনির্ভরশীলতার প্রতীক আরমিনা

এ এস এম আখতারুল ইসলাম

সমাজে বেশিরভাগ মানুষই জীবন চলার পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে, পরাজিত হলে অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দায়মুক্ত হতে চান। কিন্তু যাঁরা সুখ-দুঃখ আর বাধা-বিপত্তির তোয়াক্কা না করে 'অর্থপূর্ণ' জীবনের লক্ষ্যে অবিচল থেকে পথ চলেন, তারাই তো হন অসাধারণ জীবনের অধিকারী। অন্যরা তাকে দেখে বেঁচে থাকার প্রেরণা পান। এমনই প্রাণশক্তি সম্পন্ন মানুষ আরমিনা; যিনি জীবনের শুরুতেই বাধাগ্রস্থ হয়ে থেমে যাননি, জয় করেছেন প্রতিকূলতাকে। অন্যদের কাছে হয়ে ওঠেছেন প্রেরণার প্রতীক।

আরমিনার পুরো নাম সৈয়দা আরমিনা আক্তার। বাবা সৈয়দ আজিজুল হক ও মাতা জাহানারা বেগম। পিতা-মাতার স্নেহমাখা আরমিনা হেসে-খেলেই বেড়ে ওঠেন কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে। ৫ বোন ও ২ ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন পরিবারের বড় সন্তান। ছোটবেলায় আরমিনা একটু ডানপিটে স্বভাবের ছিলেন; পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যমনি ছিলেন তিনি।

৬ বছর বয়সে আরমিনা ভর্তি হন কুলিয়ারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পড়াশোনায় ভালো হওয়ায় শিক্ষকদের প্রিয় ছিলেন তিনি। প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব শেষে আরমিনা ভর্তি হন কুলিয়ারচর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে। সেখানে লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তিনি সমান মেধার সাক্ষর রাখেন। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আরমিনার লেখাপড়া এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৮৯ সালে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

আরমিনার দু'চোখে স্বপ্নঘুড়ি খেলা করে, সে যেন উড়ে যাবে বহুদূরে; যেখানে গেলে 'মানষ' মানুষ হয়ে ওঠে। কিন্তু বাঁধ সাধে সৈয়দ বাড়ির ঐতিহ্য। এ বাড়ির 'ঐতিহ্য' অনুযায়ী মেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে দেয়া হতো। ব্যতিক্রম হলো না আরমিনার ক্ষেত্রেও। বিয়ে হয়ে যায় মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার উন্নয়নকর্মী এম. এ. হামিদের সাথে। কিশোরগঞ্জের আরমিনাকে অল্প বয়সে বৌ হয়ে চলে যেতে হয় শ্রীমঙ্গলে। স্বপ্নঘুড়ি পথ হারালো।

আরমিনা এখন স্বামীর সংসারে। আরমিনা পথহারা স্বপ্নঘুড়িকে ছিড়ে যেতে দেননি, যত্নে আগলে রেখেছিলেন। আরমিনার আকাঙ্ক্ষা স্বামীর নজর কাড়ে। তাঁর লেখাপড়া ও সমাজ পরিবর্তনের আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হন স্বামী এম. এ. হামিদ। স্ত্রীকে ভর্তি করিয়ে দেন শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজে। সংসার ও পড়ালেখা দু'টোই সমান তালে চলতে থাকে আরমিনার। ১৯৯৩ সালে কৃতিত্বের সাথে মানবিক বিভাগ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন। এ সময়ই তার কোল আলো করে আসে প্রথম সন্ত ান তোয়াহিরা নাসরিন জলি। এরপর জন্ম নেয় নাফিসা ইয়াসমিন তুলি ও সাদিয়া ওয়াসিমা লিলি। সে সময়টাতে আরমিনার স্বামী অবস্থান করতেন কর্মস্থল চট্টগ্রামে। যে কারণে আরমিনাকেই সংসারের যাবতীয় কাজ সামাল দিতে হতো। পাশাপাশি তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখেন নানা ধরনের সামাজিক কাজে। সামাজিক কাজকর্মের পাশাপাশি সেলাই প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল ও দক্ষ করে গড়ে তোলেন তিনি। একইসাধে তিন মেয়ে জলি, তুলি ও লিলিকেও সমাজ সচেতন করে গড়ে তুলতে থাকেন।

এ রকম এক সময়ে এসে পরিচয় ঘটে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে। এ সূত্র ধরেই তিনি ২০০৮ সালে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ২৯তম ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশ নেন। নারীনেত্রী হিসেবে শুরু হয় তার নতুন পথচলা। প্রশিক্ষণ শেষে তৈরি করেন মাসিক কর্মপরিকল্পনা। কিভাবে এলাকার মানুষের উন্নয়ন করা যায় সে চিন্তায় তিনি মগ্ন হয়ে পড়েন। স্থানীয় নারীদের সংগঠিত করে তাদের নিয়ে নিয়মিত উঠান বৈঠকের আয়োজন করতে থাকেন। এ ছাড়া বিভিন্ন দিবস পালনসহ নানাবিধ সামাজিক কাজে নারীদের উৎসাহ দিতে থাকেন আরমিনা। ২০০৯ সালে আরমিনা তার বড় মেয়ে জলি এবং স্বামী হামিদসহ অংশ নেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ আয়োজিত ১৬৩০তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে। আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের নারী-পুরুষদেরও শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালাপুর ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে তিনি

নিয়ে আসেন। 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন তার মনে দারুণ রেখাপাত করে।

সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্যোগ নেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আয়োজন করেন সেলাই প্রশিক্ষণ। ৪টি ব্যাচে ৩০ জন করে মোট ১২০ জন নারী অংশগ্রহণ করে সেলাই প্রশিক্ষণে। প্রশিক্ষণে অংশ নেয়া আঞ্জু আক্তার ও শাহিলা আক্তারের মতো অনেক নারীই এখন আত্মনির্ভরশীল; যারা সেলাই করে এখন প্রতিমাসে আয় করেন প্রায় ৩ হাজার টাকা।

শুধু সেলাই নয়, নিজ নিজ বসতবাড়িতে সবজি চাষ বিষয়ক এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন আরমিনা। এসব প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে শহীদ মিয়া ও সালাম ভূঁইয়ার মতো এলাকার অনেকে সাফল্যের মুখ দেখেছেন। এখন তারা সবজি বাগান থেকে প্রতিমাসে আয় করেন প্রায় ৮ হাজার টাকা।

আরমিনা তার এলাকায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালু করেছেন। পাশাপাশি তিনি নারী-পুরুষের বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আর এসব কাজে সহযোগিতা করছেন তার স্বামী এম.এ. হামিদ।
আরমিনা এখন শুধু প্রশিক্ষণের মাঝেই সীমাবদ্ধ নন। ইতিমধ্যে ৬০ জন মহিলাকে গণশিক্ষার মাধ্যমে নাম স্বাক্ষরসহ বই পড়া শিখিয়েছেন। এ কাজে তাকে সহযোগিতা করে বড় মেয়ে তোয়াহিরা নাসরিন জলি। সমাজের উন্নয়নে এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছেন কালাপুরের নারীনেত্রী আরমিনা।

স্বেচ্ছাশ্রমের পাশাপাশি বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত রয়েছেন। তিনি জানান, ছেলেমেয়েদের স্বচ্ছলভাবে মানুষ করার লক্ষ্যেই তার চাকরি নেয়া। সমাজের উন্নয়নে তিনি এলাকার নারী-পুরুষদের সংগঠিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। ইতিমধ্যে তাদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন সিরাজনগর সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র। ৬২ জন সদস্য নিয়ে ওঠা এ সমিতির বর্তমান সঞ্চয় প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

আরমিনার বিশ্বাস, সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসে, তবেই ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হবে।

নারী উদ্যোক্তা কামরুন্নাহারের এগিয়ে চলা

এ এন এম নাজমুল হোসেন

আমরা এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখি; যেখানে মানুষ সম্মান ও নিরাপত্তার মধ্যে জীবন যাপন করবে, নারী-পুরুষ উভয়ের থাকবে সমান অধিকার। কথাগুলো কামরুন্নাহার লিপির। শূণ্য থেকে শুরু করেছিলেন। আর এখন তিনি নারীনেত্র কারুপণ্য নামের একটি প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী। এ প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মরত রয়েছেন অন্তত দেড়শ মানুষ। তার প্রতিষ্ঠানের তৈরি শপিং ব্যাগ এখন দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে। আত্মপ্রত্যয়ী আর পরিশ্রমী হলে যে কোন মানুষের পক্ষেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব- কামরুন্নাহারের এ বিশ্বাসই যেন তার সাফল্যের মূলমন্ত্র।

সংগ্রামী এ নারীর বাড়ি নেত্রকোনা সদর উপজেলার কাইলাটি ইউনিয়নের অনন্তপুর গ্রামে। ৯ ভাই- বোনের মধ্যে কামরুন্নাহার পঞ্চম। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় সবার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব ছিল না স্কুল শিক্ষক পিতার পক্ষে। তাই সেই ছোটবেলা থেকেই অভাবের সাথে পরিচিত তিনি। এ অবস্থায় লড়াই করেই তিনি এইচ.এস.সি পাশ করেন। কিন্তু অভাবের কারণে কামরুন্নাহার আর যেন এগুতে পারছিলেন না। জীবিকার তাগিদে ২০০৪ সালে মাত্র ৬শ' টাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। প্রায় তিন বছর কাজ করার পর তার বেতন বেড়ে দাঁড়ায় তিন হাজার টাকা।

২০০৮ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র উদ্যোগে কাইলাটি ইউনিয়নের স্থানীয় উজ্জীবকদের নেতৃত্বে আয়োজন করা হয় ৮২৪তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। এলাকার অন্য অনেকের মতো কামরুন্নাহার চার দিনব্যাপী সে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণটি তার আত্মশক্তি বাড়িয়ে দেয়। তাই নিজেই কিছু করার কথা ভাবতে লাগলেন তিনি। ২০০৮ সালে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে সেলাই প্রশিক্ষণ নেন। কিন্তু নিজের সেলাই মেশিন না থাকায় পরিচিত একজনের কাছে একটি মেশিন ধার নেন। সেই মেশিন দিয়েই আশপাশের পাঁচজন নারীকে সেলাইয়ের কাজ শিখান।

একদিন কোন এক কাজে জেলা শহরে গিয়ে দেখেন ফুটপাতে ছোট ছোট দোকানে কম দামে বাচ্চাদের হাফপ্যান্ট বিক্রি হচ্ছে। আগ্রহ নিয়ে এক দোকানীর কাছ থেকে জেনে নিলেন কত টাকায় এবং কোন জায়গা থেকে এ প্যান্টগুলো আনা হয়। সব জেনে তিনি আরও কমদামে একই ধরনের প্যান্ট তৈরি করে দেয়ার প্রস্তাব দেন। এতে দোকানীও রাজি হলেন।

বাড়ি ফিরে পুরোদমে প্যান্ট বানানোর কাজ শুরু করলেন। কিন্তু এভাবে প্যান্ট বিক্রি করে তেমন লাভ হতো না। এক সময় কামরুন্নাহার জানতে পারেন ঢাকায় কম দামে কেজি দরে কাপড় বিক্রি হয়। খোঁজ-খবর নিয়ে ঢাকায় গিয়ে সে কাপড় কিনে আনলেন। ওই কাপড়ে প্যান্ট বানিয়ে মোটামুটি লাভ হতে থাকল। আরেকবার ঢাকায় গিয়ে তার চোখ পড়ে কাপড়ের

তৈরি শপিং ব্যাগ। তিনি খেয়াল করলেন প্যান্টের চেয়ে এ ব্যাগ বানানো সহজ। সঙ্গে সঙ্গে একটি ব্যাগ কিনে ফেললেন। বাড়িতে গিয়ে ব্যাগটি খুলে প্রথমে নিজে এটি তৈরি করার কৌশল শিখে নেন এবং তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পাঁচ নারীকে কাজটি শেখান। এরপর শুরু করেন ব্যাগ তৈরির কাজ। স্থানীয়ভাবেই সেই ব্যাগ বিক্রি করে ভালই লাভ হতে থাকল।

ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে শপিং ব্যাগ বিক্রি। ২০১০ সালে দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশে শপিং ব্যাগ বিক্রি শুরু করেন কামরুন্নাহার । তিনি বলেন, 'আমার তৈরি ব্যাগ নেত্রকোনার অধিকাংশ দোকানে পাওয়া যায়। ব্যাগের গায়ে আমার মুঠোফোনের নাম্বার থাকায় অনেকেই ফোন করে আমার কাছে তাদের ব্যাগের চাহিদা জানান'। বর্তমানে তিনি সৌদি আরব ও ভারতে তার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার ব্যাগ পাঠাচ্ছেন। চাহিদা থাকায় তিনি চটের ব্যাগও তৈরি করতে শুরু করেছেন। সম্প্রতি ইটালি থেকে চটের ব্যাগের অর্ডার পেয়েছেন। বর্তমানে ১৫টি সাইজে ব্যাগ তৈরি করছেন কামরুন্নাহার ।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পাওয়ার সুবিধা পেতে উপজেলা সমবায় কার্যালয় থেকে নারীনেত্র উন্নয়ন সমিতি নামে প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন করেন। ধীরে ধীরে সেলাই প্রশিক্ষণ, স্ক্রিন প্রিন্টসহ নানান কার্যক্রম শুরু করেন। প্রতিষ্ঠানটি আর সমিতি হিসেবেও নেই। গত বছর থেকে নারীনেত্র কারুপণ্য নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা শুরু করেছেন তিনি।
কামরুন্নাহার জানান, এখানে কাজ করতে আসা অনেকেই এখন আবারও পড়াশোনা শুরু করেছেন। তিনি নিজেও একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়ছেন। নারীনেত্র কারুপণ্যে কর্মরত ইয়াসমীন জানান, প্রায় তিন বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। বেশ ভালোই চলছে তার। এখানে ছয় মাস পরপর আনুপাতিক হারে পারিশ্রমিক বাড়ানো হয়।

শুধু ব্যবসা নয়, নিজ এলাকায় নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, যৌতুকমুক্ত বিয়ের আয়োজন করা এবং শিশুদের বিদ্যালয়গামী করাসহ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছেন কামরুন্নাহার। কারুপণ্যে কাজ করা মেয়েদের কাউকে যেন বাল্যবিয়ের শিকার হতে না হয় সেজন্য তাদের পিতামাতাকে সচেতন করে তুলেছেন।

গতানুগতিক ও পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কামরুন্নাহার আজ একজন নিবেদিত সৈনিক। আপন চেষ্টায় সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য। স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কামরুন্নাহার এ সম্পর্ককে নারীদের জন্য যথাসম্ভব কল্যাণমূলক কাজে লাগানোর জন্য ব্যবহার করেন। তার তৎপরতায় ইতোমধ্যেই ১৭টি বাল্য বিবাহ বন্ধ হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে সালিশের মাধ্যমে সমাধান করেছেন অনেক মেয়ের সাংসারিক ও সামাজিক জটিলতা। এছাড়া নারীনেত্র কারুপণ্যের উদ্যোগে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয়।

কামরুন্নাহার মনে করেন, শুধুমাত্র দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের কারণেই নারীনেত্র কারুপণ্যের মত একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। একই সাথে তিনি মনে করেন, সবাই যদি তার মতো আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে এগিয়ে আসে তাহলেই সমাজের অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব।

একজন অপরাজিতা মমতাজ

আব্দুল্লাহ আল মামুন

ছোটবেলায় চাচা আব্দুল মোতালিব মাতব্বরের কাঁধে চড়ে যেতেন গ্রামের বিভিন্ন সালিশ-দরবারে। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় বাড়িতে বসে চাচার কাছে নালিশ নিয়ে আসা মানুষের কথাগুলো শুনতেন। মাঝে মাঝে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে চাচাকে অনুরোধ করতেন। তখন থেকেই সমাজের মানুষের বিপদে এগিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় মমতাজ বেগমের। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই আকাঙ্ক্ষাও বাড়তে থাকে কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকূলতা দেয়াল হয়ে দাঁড়ায় তার এই স্বপ্ন পূরণে ।

মমতাজ ১৯৬০ সালের ১০ মার্চ কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার উত্তর জাফরাবাদ গ্রামের এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুল হামিদ পেশায় কৃষক ও মা মালেকা বানু-গৃহিণী । চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে মমতাজ বেগম সবার বড়। বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে ও পরিবারের বড় সন্তান হওয়ায় সবার কাছ থেকে খুব আদর পেতেন তিনি।

বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরের মাছিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয় মমতাজের শিক্ষাজীবন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৯৭১ সালে ভর্তি হন করিমগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। দেখতে দেখতে নবম শ্রেণীতে উঠেন মমতাজ। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি কৃষক বাবা। তাঁর পক্ষে সাত সদস্যের পরিবারের ভরণ পোষণ চালানো খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে বাবা-মা মমতাজের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন। বাড়িতে বসে মাকে সংসারের কাজে সহযোগীতা করতে থাকেন তিনি। এর পাশাপাশি পাড়ার মহিলাদের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা চালিয়ে যান। নিজের পরিবারের কাজ ফেলে অন্যকে সাহায্য করাকে এলাকার অনেক লোকই ভালভাবে গ্রহণ করতে পারতো না। তারা মমতাজকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে।

এ পরিপেক্ষিতে ১৯৭৩ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে কুলিয়ারচর উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামের নুরুল ইসলামের সাথে মমতাজের বিবাহ সম্পন্ন হয়। স্বামী নুরুল ইসলাম পেশায় পল্লী চিকিৎসক। দুই ভাই তিন বোনের মাঝে সবার ছোট হওয়ায় নুরুল ইসলামকে সবাই খুব আদর করতেন; যার ফলে নতুন সংসারে সবার সহযোগিতা পেতে থাকেন।

দেখতে দেখতে মমতাজের সংসার জীবনের ১৪টি মাস কেটে যায়। এরমধ্যে তার কোলে আসে প্রথম কন্যা সন্তান পারভীন আক্তার। এর দুই বছর পর জন্ম নেয় দ্বিতীয় কন্যা ইয়াছমিন। আর ১৯৮২ সালে তৃতীয় কন্যাসন্তান ইয়াসমিন আক্তার জন্মগ্রহণ করে।

স্বামী-সন্তান নিয়ে ভালই কেটে যাচ্ছিল মমতাজের সংসার। কিন্তু ১৯৮৪ সালে লিভার জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান মমতাজ বেগমের স্বামী নুরুল ইসলাম। মাত্র ২৪ বছর বয়সে বিধবা হন তিনি। শ্বশুর বাড়িতে তার একমাত্র আপনজন ছির তার শ্বাশুড়ি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস কিছুদিন পর তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। এরপর থেকেই শুরু হয় মমতাজের এক অন্য জীবন। তিন কন্যার পড়ালেখা ও একটি ভাল পরিবেশে বড় করে তোলার কথা চিন্তা করে বাবা-মায়ের আগ্রহে মমতাজ ১৯৮৬ সালে শ্বশুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে চলে আসেন ।

বাবার বাড়িতে তিন কন্যা নিয়ে থাকার মত কোনো ঘর ছিল না। তাই বসবাস করার জন্য বাবার ভিটাতেই খড়ের চালা দিয়ে ছোট একটি ঘর তোলেন। এ সময় সংসারের খরচ যোগাতে মমতাজ একটি কাজের সন্ধান করতে থাকেন। প্রাথমিকভাবে বাড়িতে বসে টিউশনী শুরু করেন তিনি। ১৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জন অতি দরিদ্র হওয়ায় মমতাজ তাদের কাছ থেকে টাকা নিতেন না। কিন্তু এ আয় দিয়ে তো আর সংসার চলে না। জীবনের তাগিদে ছুটে বেড়িয়েছেন শুধু একটি কাজের জন্য। অবশেষে ১৯৮৮ সালে 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ'র আওতাধীন পরিবার পরিকল্পনায় মাঠকর্মী হিসেবে কাজ পান মমতাজ। ১৫০ টাকা মাসিক ভাতায় এ কাজ পেয়ে সন্তানদের নিয়ে কোনো রকমে চলার একটি উপায় খুঁজে পান। কিন্তু এ কাজের জন্য তাকে সারাদিন থাকতে হত গ্রামের কোনো না কোনো নারীর কাছে। গ্রামের নারীরাও কোনো সময় সমস্যায় পড়লে তার কাছে ছুটে আসতো। এতেই যেন জীবনের মজা খুঁজে পান তিনি। এ সময় শ্বশুর বাড়ির লোকজনের সহযোগিতায় স্বামীর সম্পত্তির পুরোটাই বুঝে পান। এ জমিগুলো বিক্রি করে বাবার বাড়ির পাশে কিছু ফসলি জমি ক্রয় করেন তিনি।

১৯৯৭ সালে সারা দেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের হাওয়া আসে। এ সময় স্থানীয় নারীদের উৎসাহে জাফরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী হন। পাঁচ জন প্রাথীকে পরাজিত করে বিজয়ী হন মমতাজ। মেম্বার হিসেবে শপথ নেয়ার পর তার দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। বৃদ্ধি পায় তার কাজের পরিধি। অদম্য মমতাজ ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কাজে বিশেষ করে এলাকার গরিব-অবহেলিত মানুষের জন্য পাঁচ বছর কাজ করে যান। ২০০২ সালেও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হন। বিগত দিনের ভালবাসা ও সহযোগিতার কথা ভুলে যায়নি মানুষ। ১২শ' ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন মমতাজ। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আরও সততা ও নিষ্ঠার সাথে তিনি দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

২০০৭ সালে জঙ্গলবাড়ি মহিলা কলেজে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ৭৭৪তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন মমতাজ। 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না'-এই শ্লোগানটি দাগ কাটে মমতাজের মনে এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি তার বিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

প্রশিক্ষণের পর তিনি এলাকার পিছিয়ে থাকা নারীদের বিভিন্নভাবে সচেতন ও স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টায় ব্রত হন। হাঁস-মুরগী ও ছাগল পালনের জন্য অনেক নারীকে আর্থিক সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন তিনি। ২০১২ সালে মমতাজ বেগমের সুযোগ হয় ময়মনসিংহের প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রে ১০২তম নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করার। প্রশিক্ষণটি তার মাঝে নতুন উপলব্ধির জন্ম দেয়।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে নারীদের প্রতি প্রচলিত বৈষম্য দূর করার জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন মমতাজ। এর অংশ হিসেবে স্থানীয় নারীদের নিয়ে উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। বিশেষভাবে নারী নির্যাতন, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ বন্ধে কাজ করে যাচ্ছেন মমতাজ। তার প্রচেষ্টায় এলাকায় এ পর্যন্ত ৫টি বাল্য বিবাহ বন্ধ হয়েছে।

বর্তমানে তিনি করিমগঞ্জ উপজেলা মহিলা পরিষদের সহ-সভাপতি, উপজেলা মহিলা ফোরামের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি নারী সংগঠনের সাথে যুক্ত রয়েছেন তিনি। নারীদের নিয়ে কাজ করা আজ মমতাজ বেগমের নেশায় পরিণত হয়েছে।

মমতাজ বেগম এখন পরিবার নিয়ে বেশ স্বচ্ছলভাবে দিনযাপন করছেন। বড় মেয়ে পারভীন একটি এনজিওতে চাকরি করেন। মেজ মেয়ে ইয়াছমিন আক্তার মায়ের কাজে সহযোগিতা করেন। আর ছোট মেয়ে জেসমিন আক্তার পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত আছেন।

মমতাজের এখন শুধু স্বপ্ন দেখেন আর কোনো নারী কোনো দিন নির্যাতিত হবে না, যৌতুকের নির্মম বলী হতে হবে না কোনো নারীকে, আর বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে আমাদের এই প্রিয় দেশ।

নারীদের স্বাবলম্বী করার সংগ্রামে রিক্তার পথচলা

জয়ন্ত কর

আফরিন জাহান রিক্তা। জামালপুর সদর উপজেলার মেষ্টা ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। বাবা মোহাম্মদ ইন্তাজ আলী কৃষক আর মা আলেয়া বেগম একজন গৃহিনী। চার ভাই- বোনের অভাবের সংসারে রিক্তার জন্ম ১৯৭৭ সালের ৫উ মার্চ।

দরিদ্রতার কারণে রিক্তার লেখাপড়া খুব একটা এগোয়নি। অনেক কষ্টে অষ্টম শ্রেণী পাশ করেন তিনি। এরপর পাশের গ্রামের সহিদুল ইসলামের সাথে বিয়ে দিয়ে হাফ ছাড়েন পিতা-মাতা। কিন্তু স্বামীর ঘরে গিয়েও সুখের মুখ দেখলেন না তিনি। অভাবের সংসারে কোন রকমে পার হয়ে যায় ৩টি বছর। এ সময় তার কোল জুড়ে আসে দু'টি কন্যাসন্তান। অভাবের তাড়নায় এক পর্যায়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় রিক্তার। তাই বাধ্য হয়ে পাড়ি দেয় সুদূর চট্টগ্রামের উদ্দেশে। সন্ত ানদের বাড়িতে মায়ের কাছে রেখে রিক্তা চট্টগ্রামের একটি পোশাক কারখানায় অতি অল্প বেতনে একটি চাকরি নেন। দেড় বছর কাজ করে কাজের পরিবেশ পছন্দ না হওয়ায় রিক্তা আবারও ফিরে আসেন নিজ বাড়িতে। এরপর এলাকার অন্য এক নারীর সহায়তায় কিছুদিন আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের সাথে সেলাই কাজ করে দিন বদলের চেষ্টা করতে থাকেন। পরবর্তীতে সে সুযোগও নষ্ট হয়ে যায়।

ভাগ্য অন্বেষণে রিক্তা কিছু একটা করার উপায় খুঁজতে থাকেন। ২০০৯ সালে এলাকার কয়েক জনের সাথে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ পরিচালিত ১৫৬৬তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তার ভাষায়, প্রশিক্ষণের চারটি দিন ছিল নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার সময়। এক নতুন অন্তর্নিহিত শক্তিতে বলীয়ান হয়ে চলার পথের একটি সচেতন দিশা যেন খুঁজে পেলেন তিনি। রিক্তা অনুধাবন করলেন, শুধু একা দিন বদলের সংগ্রামে কৃতকার্য হওয়া কঠিন, তাই এলাকার ১৬০ জন দুস্থ নারীকে সংগঠিত করে গড়ে তোলেন 'চিত্রলেখা মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি'। প্রত্যেক সদস্য প্রতি সপ্তাহে ১০ টাকা করে সঞ্চয় শুরু করেন। সমিতির বর্তমান সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। রিক্তা বর্তমানে এ সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

রিক্তার পরামর্শে সমিতির সঞ্চয়ের টাকা থেকে গড়ে ওঠেছে চিত্রলেখা মিনি গার্মেন্টস। বর্তমানে এ গার্মেন্টেস এলাকার ৫০ জন নারী বেড কভার, কাঁথা, থ্রিপিস ও শাড়ী তৈরির কাজ করছে। জামালপুর ও ঢাকার বিভিন্ন অভিজাত শো-রুম থেকে বড় বড় অর্ডারের কাজ নিয়ে এখন খুবই ব্যস্ত চিত্রলেখা মিনি গার্মেন্টেস এর নারীরা। এখানে কর্মরত প্রতিটি মেয়ে মাসে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা আয় করেন। আর রিক্তা মাসে আয় করেন প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা। রিক্তা মনে করেন, পুরুষশাসিত সমাজে এককভাবে একজন নারীর যে কোন কাজ করা খুবই কঠিন, দরকার সংগঠিত উদ্যোগ। এ চিন্তা থেকে রিক্তা নিজ উদ্যোগে পায়ে হেঁটে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তার এলাকার নারীদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন ২০টি স্বাবলম্বী মহিলা সমিতি। প্রতিটি সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৫ থেকে ২৫ জন। সমিতিগুলোর সদস্যরা নিজেদের উদ্যোগে চিত্রলেখা সমিতির মতো সঞ্চয় করে যাচ্ছেন। প্রতিটি সমিতির উদ্যোগেই এক একটি মিনি গার্মেন্ট গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন এর সদস্যরা। রিক্তার এ উদ্যোগ দেখে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই তাকে আরও ২০টি সেলাই মেশিন দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

রিক্তা মিনি গার্মেন্টস এবং সমিতি ইত্যাদি পরিচালনার পাশাপাশি একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও পরিচালনা করছেন। ইতোমধ্যেই তিনি এলাকার প্রায় ২শ' জন বেকার নারীকে দক্ষ করে গড়ে তুলেছেন, যাদের প্রতেকেই এখন স্বাবলম্বী। রিক্তা ২০১০ সালে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত ৪০তম 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশ নেন। এ প্রশিক্ষণ বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভয়াবহ চেহারা তার কাছে উন্মুক্ত করে দেয়। তিনি অনুভব করেন, গতানুগতিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই নারীর স্ব-কর্মসংস্থানের পথে বড় অন্তরায়। তাই এ ব্যবস্থা ভাঙ্গতে না পারলে নারীদের অবস্থার উন্নতি অসম্ভব। তাই তিনি সংগঠিতভাবে এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সদা অগ্রসর থাকেন। তার সমিতির

প্রতিটি নারীকে তিনি এ মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন। ফলে এলাকায় রিক্তার নেতৃত্বে এক ঝাঁক নারীনেত্রী এখন এ সবের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছেন।

রিক্তার নেতৃত্বে এ পর্যন্ত ৮টি বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছে, ১৪টি যৌতুকমুক্ত বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া কার্যকর সালিশের মাধ্যমে প্রায় ৩০ জনেরও বেশি নারীকে নির্যাতন থেকে মুক্ত এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে রিক্তা সহযোগিতা করেছেন। রিক্তা ও তার দলের নেতৃত্বে প্রতি মাসে গড়ে ১৫ থেকে ২০টি ইস্যুভিত্তিক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়; যেখান থেকে নারীরা বিভিন্ন ইস্যুতে মুক্তির মন্ত্র লাভ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শপথ নেয়।

মাত্র তিন বছর আগেও মেষ্টা ইউনিয়নের হাজিপুর গ্রামে রিক্তা নামে কেউ বাস করে, তা তেমন কেউ জানত না। কিন্তু বর্তমানে সেই অজপাড়া গাঁয়ের রিক্তাকে স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা এবং বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এক নামে চিনে। যারা এক সময় তার কার্যক্রমের সমালোচনা করত, রিক্তা তার কাজ দ্বারা সমালোচনার জবাব দিয়ে তাদেরকে বন্ধু করে নিয়েছেন। আর তাই রিক্তা এখন নিজের সংগ্রামে এক পরিবর্তিত স্বাবলম্বী মানুষ। এলাকায় অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী ও আত্মমর্যাদাবান মানুষে রূপান্তরিত করার চিন্তাকে কেন্দ্র করেই এখন রিক্তার পথচলা।

আনজুমান: সমাজ উন্নয়নের অগ্রপথিক

আসির উদ্দীন

নওগাঁ জেলা সদর থেকে ৫৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে পত্নীতলা উপজেলার একটি ইউনিয়নের নাম আকবরপুর। এ ইউনিয়নের বাদ তিলনা গ্রামের এক সংগ্রামী নারী আনজুমান আরা। তিনি ১৯৬৯ সালে পোরশা উপজেলার মেদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আনিছুর রহমান এবং মাতা ফরিদা বেগমের ছয় সন্তানের মধ্যে সবার বড় আনজুমান আরা।

গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশেই বেড়ে উঠতে থাকেন তিনি। গ্রামের অন্য মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন আনজুমান আরা। মাছ ধরা আর মার্বেল খেলার পাশাপাশি আম ও তাল কুড়ানোয় ছিল তার বেশ ঝোঁক। মেদা গ্রামের এই দুরন্ত মেয়েটির শিক্ষাজীবন শুরু হয় শিশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এ স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করেন। কিন্তু তার পড়ালেখা আর এগোয়নি। মাত্র ১২ বছর বয়সে বাদ তিলনা গ্রামের আবুল হোসেনের সাথে দুরন্ত মেয়ে আনজুমান আরার বিয়ে হয়ে যায়। ভাল ছেলে আর আবুল হোসেনের পরিবারের সুনাম থাকায় তার বাবা-মা কিশোরী আনজুমান আরাকে বাধ্য করেন বিয়ে করতে। মুখ ফোটে কিছু বলতে পারেননি তিনি। বরং সমাজের কঠিন বাস্তবতায় নিজেকে বিসর্জন দেন আনজুমান। আর এভাবেই নিজের মনের ভেতরের অধরা স্বপ্নগুলো স্বপ্নই থেকে যায়।

আনজুমানের স্বামী আবুল হোসেনের পড়ালেখা কম হলেও তার আচার-আচরণ ইতিবাচক। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আনজুমানের ভাল বন্ধু হয়ে ওঠেন। স্বামীকে স্বাক্ষর জ্ঞান দিয়ে আধুনিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন আনজুমান। কিন্তু বিয়ের দু'বছর না পেরুতেই সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। শ্বশুর-শ্বাশুড়ি তাকে যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু তাদের দাবী পূরণ না হওয়ায় নানান গঞ্জনা এবং শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হন তিনি। তবে এ সময় আদর্শ বন্ধু হিসেবে স্বামী আবুল হোসেন তাকে আগলে রাখেন। সংসার টিকিয়ে রাখতে শ্বশুর-শ্বাশুড়ির নিকট থেকে আলাদা হয়ে যান তারা।

এ সময় সংসারে তাদের সম্বল মাত্র ২শ' ৫০ টাকা। দিশেহারা না হয়ে আনজুমান উপায় খুঁজতে থাকেন। নিজেদের সামান্য কৃষিজমিতে শাকসবজি উৎপাদন শুরু করেন। স্বামীকে কৃষি কাজে আর বাসায় কাপড় সেলাইয়ের কাজ করতেন তিনি। আর এ সামান্য উপার্জন দিয়ে কোন রকমভাবে তাদের সংসার চলতে থাকে।

১৯৮৫ সালে এক পুত্র সন্তান জন্ম দেন আনজুমান আরা। আদর যত্ন দিয়ে ছেলেকে মানুষ করতে থাকেন। শত কষ্টের মাঝেও ছেলেকে এইচ.এস.সি. পাশ করান। অভাবের সংসারে স্বচ্ছলতা আনার জন্য গরু-বাছুর সব বিক্রি করে ছেলেকে পাঠিয়ে দেন মালয়েশিয়ায়। বিদেশে গিয়ে ছেলে বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠাতো। এতে আনজুমানের সংসারে স্বচ্ছলতা আসে।

এ সময় সাংসারিক কাজের নানাবিধ কাজের সাথে যুক্ত হন আনজুমান। গ্রামের নারীদের সাথে ভাল সম্পর্কের জন্য তাদের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন তিনি। নিজের ঘরে সামান্য খাবার থাকলেও অনাহারী প্রতিবেশিকে খাবারের ব্যবস্থা করতেন। ২০০৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য গ্রামের অন্য নারীরা তাকে উৎসাহ দেন। তাদের উৎসাহে প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে বিপুল ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিনের সংসার পরিচালনার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান আনজুমান। অল্প সময়ের মধ্যেই ইউনিয়ন পরিষদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে ওঠেন তিনি। বিভিন্ন প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন এবং অবকাঠামোগত প্রকল্প পরিচালনায় অত্যন্ত নিষ্ঠার পরিচয় দেন আনজুমান। এর ফলে শুধুমাত্র নিজের এলাকায় নয় পুরো ইউনিয়নে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

এরমধ্যে ২০০৮ সালের আগষ্ট মাসে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত ১৩৭৭তম বিশেষ উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন আনজুমান আরা। পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা শুনে তার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে মেলে ধরার কৌশল আয়ত্ব করেন তিনি।

প্রশিক্ষণ শেষে আনজুমান একখন্ড অগ্নিশিখা হিসেবে ফিরে আসেন এলাকায়। নিজ গ্রামের স্যানিটেশন সমস্যা মাত্র চার মাসে সমাধান করে তাক লাগিয়ে দেন। ১২টি সিডিএফ গঠন ও তাদের সক্রিয় রেখে পত্নীতলা উপজেলায় শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনকারি গ্রাম হিসেবে বাদ তিলনা পরিচিত হয়ে ওঠে। অন্যরাও আনজুমান আরাকে দেখে নিজেদের গ্রামে সমস্যা স্যানিটেশন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। এর এক বছর পর রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ৩২তম 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন আনজুমান। প্রশিক্ষণের আলোচ্যসূচি যে তার জীবনের সাথে এভাবে মিলে যাবে তা কল্পনাও করতে পারেন নি আনজুমান। নারীর অধঃস্তনতার জন্য এতদিন শুধু ভাগ্যকে দোষ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি আজ বুঝতে পেরেছেন যে, নিজেদের অসচেতনতা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই নারীর এগিয়ে চলার পথে প্রধান বাধা।

"একা নয় সংগঠিত হয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং প্রতিটি নারীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে মানসিক ও আর্থিকভাবে, নতুবা মুক্তি নেই আমাদের"। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্যাডের পাতায় অবচেতন মনেই লিখেছিলেন কথাটি। বাড়ি ফিরে সে অনুযায়ী কাজও শুরু করলেন তিনি। কাউকে আইন অমান্য করতে দেখলে সাথে সাথে তার প্রতিবাদ করতেন। একইসাথে এলাকার নারীদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। অবহেলিত নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে গড়ে তোলেন 'স্বনির্ভর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি'। বর্তমানে এ সমিতির পুঁজি প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এছাড়া এ সমিতির উদ্যোগে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুক বিরোধী প্রচারণা এবং পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে সকল সদস্যদের নিয়ে কাজ করছেন আনজুমান আরা।

ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ফেরার পথে হঠাৎ শোনেন ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এক মেয়ের বিয়ে হবে। সাথে সাথে ছুটে যান ঐ মেয়ের বাড়িতে। ১৩ বছরের মেয়ে রুমা খাতুন আনজুমান আরাকে দেখে জড়িয়ে ধরে। বাবা আতিয়ার এবং মা আতিকুন নেছাকে বাল্যবিবাহের কুফল বর্ণনা করেন এবং পাত্রপক্ষকেও বিয়ের ব্যাপারে আর না এগুনোর আহবান জানান। এভাবেই ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী শাহনাজ খাতুন, ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী ছাহেরা খাতুন এবং ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী আম্বিয়া খাতুনের বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন আনজুমান আরা। এ সব মেয়েরা আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদে এখনও লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

এ ছাড়া নিজের ইউনিয়ন এবং পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের ১১ টি পারিবারিক বিরোধ মীমাংসা করার ক্ষেত্রে আনজুমান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এসব পরিবারে ফিরিয়ে এনেছেন সুখ শান্তির বার্তা। এ সময় এলাকায় যৌতুক বন্ধেও তিনি সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। তার প্রচেষ্টার ফলে যৌতুক ছাড়াই ১৪টি বিয়ে হয়েছে। নারীনেত্রী আনজুমান বর্তমানে আকবরপুর ইউনিয়ন এবং পত্নীতলা উপজেলা বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

অসহায় নারীদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে তিনি এলাকায় ১৩টি সেলাই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। এরমধ্যে ২৮ জন নারী কাপড় সেলাইয়ের কাজ করে আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়েছেন। এছাড়া গ্রামের ৪০জন নারীকে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে লিখতে, পড়তে এবং হিসাব করতে শিখিয়েছেন। তার হাত ধরে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন ঘটিয়ে আকবরপুর ইউনিয়ন এগিয়ে চলেছে। তার বিশ্বাস, বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেলেই নারী মুক্তি অবধারিত।

লাভলী: এক সফল জীবনযোদ্ধা

মোঃ আমিরুল ইসলাম ও খোরশেদ আলম

সামাজিক ব্যবস্থা যেমন নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যবধান এবং বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, তেমনি সমাজের মধ্যেই তা মোকাবেলায় তৎপরতা বিদ্যমান। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা এবং নগর-গ্রামাঞ্চলসহ বিভিন্ন স্তরে সামাজিক অধিকার আন্দোলনের কর্মীগণ নারীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এমনই এক অবিচল সমাজকর্মী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার লাভলী।

লাভলীর জন্ম ১৯৭৫ সালে ধানখোলা ইউনিয়নের গাঁড়াডোব জলিপাড়া গ্রামে। তার নানী আদর করে নাম রাখেন লাভলী। বাবা আব্দুস সামাদ একজন কৃষক আর মা খাইরন নেছা গৃহিণী। নানার বাড়িতেই লাভলীর বেড়ে ওঠা।

লাভলী লেখাপড়া শুরু করেন গাঁড়াডোব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ৩য় শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় দাদার বাড়ি আসেন লাভলী। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় বাবা-মার ইচ্ছায় মাত্র ১৫ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে যায়। নতুন সংসার টিকে মাত্র সাত দিন। লাভলীর স্বামী পুরাতন প্রেমিকার হাত ধরে পালিয়ে যায়। লাভলী আশায় আশায় প্রহর গুনেছে বহুদিন। এই বুঝি স্বামী কড়া নাড়বে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসবে। কিন্তু আসেনি। অবশেষে দুই মাস পর লাভলী স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে সংসার ত্যাগ করে। নতুন উদ্যোমে লাভলী আবারও স্কুলে ভর্তি হন। নিয়মিত পড়ালেখা চালিয়ে যেতে থাকেন। এরমধ্যে এস.এস.সি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার সময় লাভলী একই গ্রামের কাঠ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আলাল হোসেনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সর্ম্পক গড়ে তোলেন। এক পর্যায়ে ১৯৯৬ সালে আলালের সাথে লাভলীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর সংসারের নানান ঝামেলায় লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটে।

প্রথম দিকে ভালই কাটছিল লাভলীর সংসার। বছর চারেক পরে তার কোলে এলো পুত্র সন্তান জীবন। এরমধ্যে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী যৌতুকের দাবিতে লাভলীকে নানাভাবে নির্যাতন শুরু করে। তাদের প্ররোচনায় স্বামী আলাল লাভলীকে ফেলে আত্মগোপন করে। অনেক দেন-দরবার ও সালিশ করেও কোন লাভ হয়নি। আলাল তাকে তালাক না দিয়েই নতুন করে বিয়ে করে সংসার শুরু করে। এ অবস্থায় কোন উপায় না দেখে লাভলী ফিরে আসেন বাবার সংসারে। লাভলীর জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। একবার মনে হয় সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে। আবার মনে হয়, না- এই পথে মুক্তি নেই। তার ফুটফুটে ছেলের দিকে তাকিয়ে আশায় বুক বাঁধে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়- তাকে বাঁচতে হবে, সামনে এগিয়ে যেতে হবে। কিছু একটা করার প্রবল ইচ্ছাবশত: লাভলী স্থানীয় এক এনজিও থেকে নয় হাজার টাকা ঋণ নেন। ছোট মুদির দোকান শুরু করেন। এখান থেকে প্রতিমাসে প্রায় তিন হাজার টাকা আয় আসতে থাকে। এতে মানসিকভাবে কিছুটা সবল হয়ে উঠে লাভলী। এর পাশাপাশি আরেক এনজিও থেকে নয় হাজার টাকা ঋণ নিয়ে নিজ গ্রামে একটা ছোট পুকুর লিজ নেন এবং মাছ চাষ শুরু করেন। এতেও ভাল লাভ পান তিনি। মাছ চাষ করে প্রতি মাসে আরো প্রায় ৬ হাজার টাকা আসতে থাকে।

এরমধ্যে একদিন স্থানীয় এক নারী মেম্বার সায়েরা খাতুন লাভলীকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার আমন্ত্রণ জানান। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ১৯২৮তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণে ক্ষুধামুক্তির আন্দোলনের ১০টি নীতিমালা ও নারীর ক্ষমতায়নের আলোচনা তাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। একই সাথে 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না' এই শ্লোগানটি লাভলীর মনে রেখাপাত করে। প্রশিক্ষণ শেষে লাভলী নিজেকে একজন উজ্জীবিত মানুষ হিসেবে ভাবতে শুরু করেন। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস ও মানুষের জন্য কিছু করার দায়িত্ববোধ বেড়ে যায়।

তার মতো আর কোনো নারী যেন নির্যাতিত না হয়, সেজন্য তাদেরকে সংগঠিত করার পরিকল্পনা নেন। ২০১২ সালের জুন মাসে নিজ গ্রামের ২০ জন নারীকে নিয়ে 'আশার প্রদীপ' এবং ১৫ জন নারীকে নিয়ে জুলাই মাসে 'সূর্য জাগরণী চক্র' নামে দু'টি সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন; যার একটিতে তিনি সভাপতি এবং অন্যটিতে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সংগঠন দু'টির মাধ্যমে ৩৫ জন দরিদ্র নারী প্রতি সপ্তাহে দশ টাকা করে সঞ্চয় করা শুরু করেন। পরবর্তীতে এই টাকা তারা নিজেদের বিভিন্ন আয়মুখি প্রকল্পে কাজে লাগান।

লাভলী এখানেই থেমে থাকেন নি। বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ১০৪তম ফাউন্ডেশন কোর্স এবং গণ-গবেষণা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে লাভলীর জানার পরিধিও বাড়তে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে নতুন উদ্যোমে কাজ শুরু করেন তিনি।

মা ও শিশুর পুষ্টি, জন্ম ও বিয়ে নিবন্ধন, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলগামী করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টি ও পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন লাভলী। এ লক্ষ্যে তিনি নিয়মিত উঠান বৈঠক ও আলোচনা সভা করছেন।

নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের আন্দোলনে একজন লড়াকু সৈনিক হিসেবে লাভলী অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাল্যবিবাহের স্বীকার লাভলী নিজ এলাকায় বাল্যবিবাহ বন্ধে এখন সোচ্চার। যেখানেই বাল্যবিবাহের ঘটনা, সেখানেই লাভলীর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও তা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ। প্রথমত: অভিভাবকদের বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেন। এতে কাজ না হলে সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যানকে সম্পৃক্ত করেন। তাতেও কাজ না হলে প্রশাসনের শরণাপন্ন হন।

শিক্ষার উন্নয়নেও কাজ করছেন লাভলী। নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে তিনি একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছেন; যেখানে লেখাপড়া শিখছেন ২৪ জন নারী। লাভলী নিজে লেখাপড়া শেষ করতে না পারার কষ্ট দূর করছেন অন্যের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে। নিজের একমাত্র ছেলে জীবনকেও লেখাপড়া করাচ্ছেন।

মা ও শিশুর পুষ্টি বিষয়ে এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য এলাকার নারীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন তিনি। এ কারণে এলাকার নারীরা আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন। এ সকল কার্যক্রম ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনে ভূমিকা রাখেন তিনি।

যে লাভলী একদিন স্বামীর অবহেলার শিকার হয়ে বাবার সংসারে ফিরে এসেছিল বোঝা হয়ে, এখন ওই সংসারের হাল ধরেছেন তিনি। লাভলীর এই সাফল্যে তার পরিবারও এখন খুশী। নিজে জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি বাবা-মা ও বোনদেরও সহায়তা করে থাকেন। তার সফলতার গল্প এখন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার ফলে স্থানীয় নারী-পুরুষ সবার কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন।

মেহেরুন আর অসহায় নয়

জাকারুল ইসলাম

মেহেরুন আর অসহায় নন। অদম্য সাহস আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অসহায়ত্বকে জয় করেছেন, হয়েছেন আত্মনির্ভরশীল। জীবনযুদ্ধে জয়ী মেহেরুনের এখন একটাই চাওয়া- এলাকার অসহায় নারীদের পাশে দাঁড়ানো ও আত্মনির্ভরশীল করা। আর এজন্য সহায়ক পরিবেশও সৃষ্টি করা।

মেহেরুন্নেছা। ডায়েরিতে বয়স লিখে রাখা বা ঘটা করে জন্ম দিন পালন করার মত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা তেমন কেউ নন। তাই সঠিক বয়স বলতে পারেন নি। তবে ১৯৫৫ সালের দিকে জন্ম হয়েছে বলে তার ধারণা। নওগাঁ সদর থানার চকউজীর গ্রামে মেহেরুনের জন্ম। বাবা আব্দুর রাজ্জাক বাবা ছিলেন সামান্য দর্জি ও মা জাহেদা খাতুন একজন গৃহিনী। উল্লেখ করার মতো তাদের কোনো জমি-জমা ছিল না। ৩ ভাই, ৩ বোন এবং বাবা-মা মিলে ৮ জনের সংসার।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় মেহেরুনের লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি। রাণীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৮ম শ্রেণী পাশ করেই পড়াশুনা থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়। পরিবারের বোঝা লাঘবের জন্য মাত্র ১৩ বছর বয়সেই মেহেরুনকে বসতে হয় বিয়ের পিঁড়িতে। ১৯৬৮ সালের দিকে বগুড়া জেলার আদমদিঘী থানার উথরাইল গ্রামের মোফাজ্জলের সাথে তার বিয়ে হয়।

বিয়ের দেড় বছর পর এক পুত্র সন্তানের মা হন মেহেরুন। মেহেরুনের বিয়ের বয়স সবেমাত্র ৩ বছর। ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যান স্বামী মোফাজ্জল। বিয়ের বয়স না হতেই বাল্যবিবাহের শিকার মেহেরুন হলেন বিধবা। ১৩ থেকে ১৬। সময়টা ৩ বছর। এরই মধ্যে সংসার, সন্তান, বিধবা! সবকিছুরই যেন স্বাদ পেলেন মেহেরুন। সমাজ ও প্রকৃতির এ নিষ্ঠুর খেলা মেহেরুন ভুলতে পারেন না কিছুতেই!

ছোট্ট শিশুকে আগলে স্বামীর ভিটাতেই থাকতে চেয়েছিলেন মেহেরুন। শ্বশুর ময়েজ মিয়া মোফাজ্জলের নাবালক শিশুপুত্রকে তার ন্যায্য অংশ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্য সন্তানেরা কায়দা করে সমস্ত জমি নিজেদের নামে লিখে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়।

উপায় না পেয়ে মেহেরুনকে ফিরে আসতে হয় দরিদ্র পিতার কুটিরে। শুরু হল বেঁচে থাকার সংগ্রাম। কাগজের বিড়ি, মাদুর তৈরি, দর্জির কাজ, হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালন করে মেহেরুন বাবার সংসারের বোঝা না হয়ে সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করেন। শিশুপুত্রকে স্কুলে ভর্তি করান।

এভাবে কেটে যায় বেশ কয়েক বছর। কিন্তু এভাবে কতদিন বাবার সংসারে থাকা যায়। মেহেরুনের চাই একটা নিজস্ব ঠিকানা। এ রকম তাড়না থেকেই তিনি সঞ্চয় শুরু করেন। ছেলে যখন দশম শ্রেণী পড়ে তখন রানীনগর উপজেলা সদরে একটি বাসা ভাড়া করে সেখানে বসবাস শুরু করেন। ১৯৮৪ সালে মেহেরুন আনসার ও ভিডিপির বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এখানে দক্ষতার পরিচয় দেয়ায় তিনি রানীনগর ইউনিয়ন আনসার ও ভিডিপির দলনেত্রী মনোনীত হন।

২ মে ১৯৮৪। শফিপুরে আনসার একাডেমীতে শুরু হওয়া সতেজীকরণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন মেহেরুন। এ প্রশিক্ষণে নওগাঁ জেলা থেকে ৬ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে একমাত্র মেহেরুনই উত্তম সনদপত্র লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি গাজীপুরের ভাওয়াল রাজার রাজবাড়িতে ৯০ দিনব্যাপী এক দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ নেন। এখানেও দক্ষতার পরিচয় দেয়ায় রানীনগর আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ে মাষ্টার রোলে তিনি দর্জি হিসাবে কাজ পান। এতে সংসারে কিছুটা স্বচ্ছলতা আসে।

১৯৯২ সালে মেহেরুন 'দুস্থ নারী কল্যাণ সমিতি' গড়ে তোলেন। সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০ জন। মাসিক সঞ্চয় সদস্য প্রতি ২৫ টাকা। ১৯৯৪ সালে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে দুস্থ নারীদের স্বাবলম্বী করার জন্য ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসাবে এককালীন ১ লাখ ৫০ হাজার টাকার অনুদান লাভ করেন।

মেহেরুন ২০১০ সালের মে মাসে নওগাঁর নারীনেত্রী আলো দাসের আমন্ত্রণে রাণীনগর কৃষি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ সেন্টারে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর ১৬৫২তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। একই বছরের জুলাই মাসে জয়পুরহাট টিএমএসএস ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত ৫৩তম নারী নেতৃত্ব বিকাশ ফাউন্ডেশন কোর্সেও অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ দু'টি তার জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। তার উপলব্ধি হয়, শুধু নিজেকে নয় বরং সব নারীদের নিয়ে মর্যাদার সাথে বাঁচতে হবে। প্রশিক্ষণে তিনি জেনেছেন নারীদের সমস্যা, এর কারণ এবং প্রতিকারের উপায়। শিখেছেন সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে। নারীর মর্যাদাহীন ও অমর্যাদাকর জীবনের মূল কারণ দূর করার জন্য মেহেরুন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।

প্রশিক্ষণের পর মেহেরুন দুস্থ নারী কল্যাণ সমিতিকে আরও এগিয়ে নেয়ার কাজে নিয়োজিত হন। বর্তমানে এ সমিতির সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ টাকা। সমাজের দরিদ্র নারীদের নিয়ে ছোট ছোট দল গঠন করে তাদেরকে বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দেন। এসবের মাধ্যমে তাদের জন্য সৃষ্টি করেন আত্মকর্মসংস্থানের পথ। দুস্থ নারীদের মধ্য থেকে প্রতি ১০ জন নিয়ে তিনি একটি দল গঠন করেন। এদের মধ্যে থেকে ৩ থেকে ৫ জনকে আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। সুদের হার বছরে ২ টাকা মাত্র। বর্তমানে ৫৩টি দলে এ রকম সদস্য সংখ্যা ৫শ' ৩০ জন। ঋণ গ্রহীতারা মাদুর তৈরি, চটের কাজ, বাঁশ ও বেঁতের কাজ, ছাগল পালনসহ বিভিন্ন আয়মুখী কাজের মাধ্যমে প্রতিমাসে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করছেন।

নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরুন নিজ বাড়িতে গড়ে তোলেন 'রানীনগর মহিলা সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'। এখানে প্রতি ব্যাচে ১০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে মেহেরুনের মাসে ৬ হাজার টাকা আয় হয়। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৩শ' জন নারী আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। এর পাশাপাশি মেহেরুন নিজেও দর্জির কাজ করেন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা, দর্জির কাজ ও আনসার ভিডিপির দলনেত্রীর সম্মানী; সব মিলিয়ে মেহেরুনের মাসিক আয় ১০ হাজার টাকার বেশি। এতে পারিবারিক জীবনে স্বচ্ছলতা আসে। রাণীনগর উপজেলা সদরে আধাপাকা বাড়িসহ ৪ শতক জমি ক্রয় করেছেন।

কর্মসংস্থান তৈরির পাশপাশি সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন তিনি। মেহেরুন নিজে বাল্যবিবাহের শিকার। তাই এর কুফল নিয়ে ৬০টিরও বেশি উঠান বৈঠকের আয়োজন করেছেন। ইতোমধ্যে ১০টি বাল্যবিবাহ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। নির্যাতিত নারীদের পাশে দাঁড়াতে ভয় পান না মেহেরুন। সমাজে মেহেরুন আজ আর একা নন। তাঁর পেছনের শক্তি হিসাবে কাজ করেছে দুস্থ নারী কল্যাণ সমিতির ৫০ জন সদস্য।

মেহেরুনের উদ্যোগে এলাকায় প্রতিবছর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবসসহ অন্যান্য দিবস পালন করা হয়। এসব কাজে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে সমাজে তার একটি অবস্থান তৈরি হয়েছে। মেহেরুনের এই তেজস্বী ভাব তাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কমিটির সাথে জড়িত হতে সহযোগিতা করেছে। তিনি রানীনগর ১নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সহকারি সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া মেহেরুন নওগাঁ

জেলা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নওগাঁ জেলা কমিটির সদস্য, মানবাধিকার নাট্য পরিষদের সদস্য এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আজীবন সদস্য। নারী হিসাবে মেহেরুন আজ অনেক বেশি সম্মানিত।

সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িত মেহেরুনের এখন শৈশবের দিনগুলো মনে পড়ে। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসেও নারী মুক্তির সংগ্রামে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তার ইচ্ছা তার এলাকার নারীদের বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, তাদেরকে সংগঠিত করে নারী নির্যাতন বন্ধ করা এবং নারীদের জন্য সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা। তিনি প্রমাণ করেছেন নারী হিসাবে তিনি আর অসহায় নয়; একইসাথে সমাজের অন্য নারীদেরকেও তিনি একইভাবে দেখতে চান।

নারী উন্নয়নের নিরলসকর্মী আহিয়া সরকার বীথি

রাজেশ দে রাজু

আহিয়া সরকার বীথি। বঞ্চিত নারীদের ভরসার স্থল। তার প্রতিবাদী কণ্ঠ এলাকার সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কথা বলে। একটি পশ্চাদপদ পিছিয়ে পড়া এলাকায় জন্ম নিয়েও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় দিয়ে নিজেকে বদলে দিয়েছেন এবং সমাজকে বদলানোর জন্য কাজ করছেন। ২৭ বছর বয়সী বীথি একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে পরিচিত। কোন কাজ করার ক্ষেত্রে কম বয়স যে বাঁধা নয়, তিনি তার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছেন। বীথির জন্ম ১৯৮৪ সালে, নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার খালিসাচাপানী ইউনিয়নের হাজীপাড়া গ্রামে। কৃষক আব্দুল হাই ও গৃহিণী আফেলা বেগমের ৩ মেয়ে ও ২ ছেলের মধ্যে বীথি তৃতীয়। ৩ বিঘা আবাদী জমি চাষাবাদ করে যে আয় হতো তা দিয়েই তাদের পরিবারের খরচ নির্বাহ হতো। সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর মত সামর্থ্য ছিল না বাবা আব্দুল হাইয়ের। তাই স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর আগের বীথির দু' বড় বোন হাবিবা ও বিজলীর বিয়ে হয়ে যায়।

কিন্তু আর্থিক অনটনের মধ্যেও দৃঢ় মনোবল নিয়ে বীথি পড়ালেখা চালিয়ে যেতে থাকেন। নাউতারা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০২ সালে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি. পাশ করেন তিনি। আর্থিক অনটনের অজুহাতে বীথির কলেজে ভর্তির হবার ক্ষেত্রে বাঁধ সাধেন পিতা-মাতা। কিন্তু তিনি আরও পড়াশুনা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামের আশপাশে কোনো কলেজ না থাকায় ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তিস্তা কলেজে ভর্তি হন তিনি। কলেজে যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম ছিল ভ্যান। তবুও সব সময় তা পাওয়া যেত না। তাই প্রায়ই তাকে পাঁয়ে হেটে কলেজে যেতে হতো।

বীথির ছোট ২ ভাই সে সময় স্কুলে পড়ত। অর্থের অভাবে তাদের লেখাপড়া যেন কোনভাবেই বন্ধ না হয় সেজন্য বীথি অর্থ উপার্জনের একটি উপায় খুঁজতে থাকেন।

২০০৩ সালে জানুয়ারিতে ব্র্যাকের স্কুল পরিদর্শিক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান তিনি। এর বিনিময়ে প্রতিমাসে তিনি ৮শ' টাকা বেতন পেতেন। মোট ৬টি স্কুল তাকে পরিদর্শন করতে হতো। স্কুলগুলোর দূরত্ব খুব কাছাকাছি না হওয়ায় অনেক সময় তাকে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যেতে হতো। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে তার পক্ষে এ কাজটি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এ চাকুরি ছেড়ে দিয়ে একই বেতনে বীথি ২০০৩ সালের জুন মাসে ব্র্যাক পরিচালিত একটি স্কুলে শিক্ষিকার দায়িত্ব নেন। ২০১০ সাল পর্যন্ত তিনি চাকরি চালিয়ে যান। বর্তমানে বীথি মাসিক ৪ হাজার টাকা বেতনে 'আরডিআরএস-বাংলাদেশ' নামক একটি বেসরকারি সংস্থায় স্যানিটেশন প্রোগ্রামে চাকরি করছেন। উপার্জিত অর্থের প্রায় পুরোটাই তিনি তার ছোট ২ ভাইয়ের লেখাপড়ার পিছনে ব্যয় করেন।

ব্র্যাকের স্কুলে যুক্ত হবার পর পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষদের শিক্ষার প্রতি প্রচণ্ড অনাগ্রহের বিষয়টি লক্ষ্য করেন। তিনি উপলব্ধি করেন- সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়া একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। তাই শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য প্রয়োজন সংগঠিতভাবে কাজ করা।

২০০৭ সালে বীথি খালিসাচাপানী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ আয়োজিত ১২০৬তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। নারীদের ক্ষমতায়ন বিষয়ক আলোচনা থেকে তিনি বুঝতে সক্ষম হন যে, অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পিছনে ফেলে জাতি হিসেবে আমরা কখনও সামনের দিকে এগুতে পারবো না। একইসাথে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোগ প্রয়োজন এবং সংগঠিতভাবে কাজ করলে সফল হওয়া সম্ভব এ বোধটিও তার মধ্যে উদয় হয়।

প্রশিক্ষণের পর বীথি নিজ এলাকার ৪৮ জন নারীকে সংগঠিত করে গড়ে তোলেন 'নারী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' নামের একটি সমিতি। তিনি সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। শুরুতে সকলের মাসিক সঞ্চয় ছিল ১০ টাকা। ২০১০ সালে এ সমিতির মোট সঞ্চয় দাঁড়ায় ৪২ হাজার টাকা। ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে মোট সঞ্চয় দিয়ে সমিতির প্রতিটি সদস্যকে একটি করে ছাগল কিনে দেয়া হয়েছে। এই ছাগল বিক্রির লাভের অর্ধাংশ পাবে সমিতি। সমিতির সদস্যরা প্রতি মাসে ৫০ টাকা করে সঞ্চয় করছেন। বর্তমানে সমিতির মোট মূলধন দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা।

নারী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠনের পর অন্য নারীরা এ সমিতিতে যোগ দিতে তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করছেন। এ অবস্থায় বীথি ২০০৮ সালের মার্চ মাসে 'নীতি কল্যাণ সমিতি' নামে আরেকটি সমিতি গড়ে তোলেন। বীথি এ সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। এ সমিতির মাসিক সঞ্চয় জনপ্রতি ৫০ টাকা। বর্তমান সমিতির মোট মূলধন ১ লাখ টাকা। সংগঠন দু'টি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ছাড়াও বীথি সমিতি দু'টির উদ্যোগে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ বন্ধ ও নারী শিক্ষার বিস্তার-এই তিনটি বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। সমিতির মাসিক বৈঠকে কার্যক্রম চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। এ দু'টি সমিতির কোন সদস্য স্থানীয় কোন এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে না। প্রয়োজন হলে নিজেদের সঞ্চয় থেকে স্বল্প সুদে সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করে।

সমিতি দু'টির কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে প্রতিমাসে সঞ্চয়ের সময় জমা বইয়ে সদস্যদের স্বাক্ষর করতে হয়। কিন্তু ১০ জন সদস্য স্বাক্ষর করতে জানেন না। বিষয়টি অনুধাবন করে বীথি তাদের নিয়ে প্রতিদিন নিজের বাড়িতেই লেখাপড়া শেখানোর কাজ শুরু করেন। ২ মাস চেষ্টার পর তারা অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন হয়। এখন তারা নিজেরা নিজেদের নাম লিখতে ও প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ করতে পারে।

বীথি সংগঠন দু'টির কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও অন্যান্য এনজিওদের সাথে যোগাযোগ রাখেন। যাতে করে বিভিন্ন ধরনের সেবা ইউনিয়নের জনগণকে প্রদান করা যায়। ২০১০ সালে ডিসেম্বর মাসে 'ব্রীফ' নামক একটি এনজিও থেকে ২শ' কম্বল সংগ্রহ করে বীথি তার গ্রামের দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন। 'রিইব' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বীথি এলাকায় ৫টি প্রাক-প্রাথমিক স্কুল চালু করেছেন। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করে। নারী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও নীতি কল্যাণ সমিতির ৫ জন সদস্য বীথি, খাদিজা, ফেন্সি, বিজলী এবং হাবিবা এ স্কুলগুলোতে স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করেন।

২০১৩ সালে জানুয়ারি মাসে বীথির উদ্যোগে নারী কল্যাণ সমবায় সমিতি নামে আরও একটি সমিতি গড়ে উঠে। এ সমিতির ২৫ জন সদস্যের সকলেই নারী। তারা প্রতি সপ্তাহে জনপ্রতি ২০ টাকা সঞ্চয় করে।

নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বীথি তার সংগঠনের সদস্যদের সাথে নিয়ে সব সময়ই সোচ্চার। ২০০৮ সালে ৬ সেপ্টেম্বর সমিতির সভা চলাকালীন সময় বীথি জানতে পারেন যে, হাজীপাড়া গ্রামে ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী সাদেকার বিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে তার পরিবার। তখনই তিনি সমিতির সদস্যদের নিয়ে সাদেকার বাবা-মাকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অবহিত করেন। তার প্রচেষ্টায় সাদেকার বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়। সেই সাদেকা তিস্তা ডিগ্রী কলেজ থেকে এ বছর এইচ.এস.সি পরীক্ষা দেবে। এ ছাড়া ২০০৭ সালে দীপ্তি রাণী, ২০০৮ সালে ফারজুমা খাতুন, ২০০৯ সালে দুলি

খাতুন ও বেবী খাতুন, ২০১১ সালে রওশন আরা এবং ২০১২ সালে মোমেনা ও সাবিনার বাল্যবিবাহ বন্ধে তিনি ভূমিকা রাখেন।

২০১০ সালের ২০ নভেম্বর রাশেদা বেগম নামের এক নারী তার স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছে- এমন খবর শুনতে পান। সাথে সাথে বীথি ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার মাজেদা বেগম ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সমস্যার সমাধান করেন। এ ছাড়া শ্বাশুড়ী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার ডালিয়া গ্রামের রিফা বেগমের সমস্যারও সমাধান করেন তিনি।

প্রতি বছরের শুরুতে শিশুদের স্কুলে ভর্তি করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন বীথি। এ লক্ষ্যে তিনি নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস থেকেই গ্রামে গ্রামে উঠান বৈঠক পরিচালনা করে থাকেন। দরিদ্র অভিভাবকদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝান এবং স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া শিশু-কিশোরদের আবার স্কুলে ভর্তি করার ব্যাপারে উৎসাহ যোগান।

বীথি ২০১০ সালে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত ৫৭তম ব্যাচে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। কোর্সটি তাকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। তিনি প্রতিমাসের ফলোআপ সভায় নিজের এলাকার অভিজ্ঞতা অন্যদের সাথে বিনিময় করেন।

বীথি কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম খালিসাচাপানী ইউনিয়ন কমিটির সদস্য। প্রতি বছর এলাকায় নারী দিবস, কন্যাশিশু দিবস, রোকেয়া দিবসসহ বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। আরও ব্যাপকভাবে নারীদের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য বীথি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিতে চান। এর মাধ্যমে তিনি ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যেতে চান।

রাজিয়া সরকারঃ নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী

নেসার আমিন

রাজিয়ার জন্ম ১৯৬৭ সালের ৩ ডিসেম্বর। কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার আটহাজারী গ্রামের এক স্বচ্ছল পরিবারে। পিতা মোস্তফা সামছুল হক আজাদ ছিলেন উমর মজিদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আর পেশায় ছিলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মাতা হামিদা বেগম ছিলেন গৃহিণী। পরিবারে রাজিয়ার এক ছোট বোন আর দুই ভাই।

চেয়ারম্যান হওয়ার কারণে রাজিয়ার পিতা সদা ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু এর মাঝেও সন্তানদের সময় দেয়ার চেষ্টা করতেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজিয়ার বয়স ছিল মাত্র ৪ বছর। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিগুলো তার খুব একটা মনে পড়ে না। কিন্তু রাতের বেলা ঘুমানোর সময় রাজিয়ার বাবা তাকে মুক্তিযুদ্ধের নানা ঘটনার বর্ণনা দিতেন। নারীর প্রতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের ঘটনাগুলো শুনে রাজিয়া লেখাপড়া শিখে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা করেন।

পিতার আদর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়েই শুরু হয় রাজিয়ার প্রাথমিক শিক্ষাজীবন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় নিজ মেধার সাক্ষর রাখেন তিনি। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে রাজিয়া ছিলেন দলনেতা। এ কারণে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাকে নেতা বলে ডাকতেন। কোন অন্যায় দেখলে রাজিয়া সাথে সাথে প্রতিবাদ করতেন। কোনদিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকলে শিক্ষকরা রাজিয়ার খোঁজ নিতেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে রাজিয়া ভর্তি হন নাজিম খান উচ্চ বিদ্যালয়ে। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনসহ নানাবিধ অনুষ্ঠানে তিনি থাকতেন প্রথম সারিতে। এসব দিবসে তার প্রতিবাদী ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর সবার নজর কাড়তো। কিন্তু এ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। তার এই প্রতিবাদী আচরণের কারণে তাকে স্কুল পর্যন্ত পরিবর্তন করতে হয়। ভর্তি হতে হয় বালাকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ে।

একদিকে রাজিয়ার শিক্ষিত হওয়ার বাসনা। অন্যদিকে দশম শ্রেণীতে থাকার সময় তাকে বিয়ে দেয়ার জন্য পরিবারের সবাই উঠে পড়ে লাগে। বিয়ের জন্য রাজিয়াকে দেখতে লোকজন নিয়মিতভাবে আসতে থাকে। কিন্তু রাজিয়া থমকে যান নি। অবিচল মনোবল নিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৮৫ সালে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি পাশ করেন। এরপর কলেজে ভর্তি হন তিনি। কিন্তু এর এক বছর পর ১৯৮৬ সালে কাগজীপাড়া গ্রামের এক শহীদ পরিবারের ছেলে আব্দুল্লাহ সরকারের সাথে তার বিয়ে হয়ে যায়।

বেকার স্বামী আব্দুল্লাহ সরকারের ছিলো অভাবের সংসার। তার ওপর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ জন। বাধ্য হয়ে সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করতে থাকেন রাজিয়া। কিন্তু স্বামীর সংসারে কেউই তাকে ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। পরিবারের বাকী সদস্যরা বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতো। এ সময় অনেক চেষ্টার পর রাজিয়ার স্বামী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান।

নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে সেবিকা প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন তিনি। এ সময় রাজিয়া নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ বন্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে থাকেন। মাঝে মাঝে স্থানীয় নারীদের সচেতন করে তোলার জন্য আলোচনা সভার আয়োজন করতেন। রাজিয়া তার কার্যক্রম শুধু নিজ গ্রামেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। সমাজে নারীদের বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে রাজিয়া ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থী হন এবং বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হয়ে সমগ্র ইউনিয়নে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। অবহেলিত নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতেও কাজ চালিয়ে যান তিনি। তাদেরকে বয়স্ক শিক্ষার আওতায় এনে স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলেন। বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় গিয়ে গিয়ে বাল্য বিবাহ বন্ধ, যৌতুকজনিত নির্যাতন ও নারী ও শিশু পাচার রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে থাকেন। তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৮ সালে নারীনেত্রী হিসেবে আরডিআরএস-বাংলাদেশ কর্তৃক স্বীকৃতি সনদ লাভ করেন। আর ২০০০ সালে লাভ করেন খান ফাউন্ডেশন কর্তৃক সনদ ও পুরস্কার। কিন্তু কখনোই

আত্মতৃপ্তি আসেনি তার মধ্যে। সমাজ উন্নয়নে তার ভূমিকা ধরে রাখতে ২০০৩ সালে আবারও ইউপি নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন।

২০০৮ সালের জুন মাসে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ১৩২৯তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। আর ২০০১ সালে অংশগ্রহণ করেন ৬৯তম 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে। প্রশিক্ষণ নিয়ে সমাজের উন্নয়নে নিজেকে নিবেদিত করার সংকল্প নেন রাজিয়া।

তাদের এলাকায় গ্রামাঞ্চলের নারীরা ভোট দেয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। বিষয়টি রাজিয়াকে খুব আহত করে। তাই নারীদের এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় অব্যাহতভাবে কাজ করে যেতে থাকেন তিনি। সফলও হয়েছেন রাজিয়া। এখন গ্রামীণ নারীরা যে কোন নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন। এসব কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৮ সালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক ইউনিয়ন শ্রেষ্ঠ নারীনেত্রী পুরস্কার লাভ করেন। আর ২০০৯ সালে কুড়িগ্রাম এনজিও এসোশিয়েশন কর্তৃক 'সুফিয়া কামাল ফেলো' হিসেবে মনোনীত হন। এছাড়া তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও ২০১২ সালে ব্র্যাক কর্তৃক সনদ ও পুরস্কার লাভ করেন।

রাজিয়া মনে করেন, নারী সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখার ফলে তিনি যে পুরস্কার পেয়েছেন তা শুধু তার নিজের একার পুরস্কার নয় বরং সমগ্র নারী সমাজের।

অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নিবেদিত কর্মী সেতারা বেগম

শামীমা রহমান

নারীনেত্রী সেতারা বেগমের জন্ম ১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার কাবিলপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে। বাবা মো. খাদেম হোসেন পেশায় একজন কৃষিজীবী আর মা সাবেরুণ নেছা গৃহিনী। ৪ ভাই ও ৬ বোনের মধ্যে সেতারা বেগম ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। সেতারার বাবা তাদের ১০ বিঘা আবাদী জমি চাষাবাদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা করতেন। ছোটবেলা থেকেই সেতারা বেগম ছিলেন শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির। কারো সাথেই কখনও মতবিরোধ হয় নি। পরিবারে সর্বকনিষ্ঠ হওয়ায় পেয়েছেন সকলেরই আদর স্নেহ।

সেতারা লেখাপড়া শুরু করেন শ্রীরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৮২ সালে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় বাবা খাদেম হোসেন মারা যান। সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে তার বড় ভাইয়ের ওপর। বড় ভাই ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনি চাকুরি ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী ও ২ সন্তানকে নিয়ে গ্রামে চলে আসেন। কিন্তু পুরো পরিবারকে তিনি একা সামাল দিতে পারছিলেন না। সংসারের সচল চাকা অচল হতে শুরু করে। বাবার মৃত্যুর সাথে সাথেই যেন পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়।

অবশেষে বাবার মৃত্যুর ৩ বছর পর ১৯৮৫ সালে সংসার ভাগ হয়ে যায়। বড় ভাই তার পরিবারসহ মায়ের দায়িত্ব নেন। সেতারা বেগমের ঠাঁই হয় ছোট ভাইয়ের সংসারে। এ সময় তাদের পৈত্রিক জমিজমাও ভাগ হয়ে যায়।

১৯৮৯ সালে নবম শ্রেণীতে পড়ার সময়েই সেতারার বিয়ে হয়ে যায়। তার স্বামী বাদশা মিয়া জামালপুরের নামাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। ৩ ভাই ও ৫ বোনের মধ্যে বাদশা মিয়ার অবস্থান ৬ষ্ঠ। স্বামীর বাড়িতে এসে যৌথ সংসারে সবার সাথে সবার সাথে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন সেতারা। শান্ত ও লাজুক স্বভাবের সেতারা দীর্ঘ ৭ বছর যৌথ সংসারে থাকেন। এর মাঝেই ১৯৯২ সালে সেতারা বেগমের প্রথম কন্যা সন্তান সুলতানা আক্তারের জন্ম হয়। আর দ্বিতীয় সন্তান আশিকুর রহমান সুমনের জন্ম হয় ১৯৯৪ সালে।

সংসারের কাজের ফাঁকে সেতারা নিজ উদ্যোগে হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল লালন-পালন করতেন। এগুলো থেকে যে আয় হোত তা তিনি সঞ্চয় করতেন। নিজের একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তিনি এ টাকা খরচ করতেন না।

একবার সংসারে অর্থের প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রী মিলে বাড়ির সামনে একটি বড় গাছ বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। সেতারা বেগমের এক আত্মীয় গাছটি বিক্রি না করে গাছের কাঠখড়ি ইটভাটায় জ্বালানি হিসেবে বিক্রয় করার জন্য তাঁকে পরামর্শ দেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি ইটভাটায় কাঠখড়িগুলো বিক্রয় করতে থাকেন। এভাবেই সেতারা শুরু করেন কাঠখড়ির ব্যবসা। এই ব্যবসা করে তিনি ভাল অর্থ আয় করতে থাকেন। এ টাকা দিয়েই সেতারা তার ঘরবাড়ি পাকা করেন এবং ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করেন।

নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় গড়ে ওঠা এ ব্যবসায় তাকে সহযোগিতা ও উৎসাহ দিতেন স্বামী বাদশা মিয়া। তবে বাদশা মিয়া বেশিরভাগ সময় তার ডেকোরেটর ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। ব্যবসা করতে গিয়ে অনেক স্থানীয় গণ্যমান্য লোকের সাথে সেতারার পরিচয় হয়। তারাই উদ্যোগী হয়ে তাকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে উৎসাহ যোগান। স্বামী বাদশা মিয়া প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে আর বাধা দেননি। ২০১১ সালে সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৮ জন প্রার্থীকে হারিয়ে মেম্বার নির্বাচিত হন। মেম্বার হওয়ার পর তার কাজের পরিধি আরও বেড়ে যায়। বিভিন্ন কাজে ৩টি ওয়ার্ডের সব গ্রামেই তাকে যেতে হয়। নানান জনের সমস্যার কথা তাকে শুনতে হয়। সেতারা নিজের অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব তাদের সহায়তা করার চেষ্টা করতেন।

২০১২ সালের ২৪ জানুয়ারি এমডিজি (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে কাবিলপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাথে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- বাংলাদেশ এর ৪ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১২ সালের ১৬-১৯ ফেব্রুয়ারী ১৩ জন মেম্বার ও সচিবসহ ১৪ জনকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ সেতারা বেগমের মানসিকতায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। 'আত্মশক্তিতে বলিয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না' এই শ্লোগানটি তাকে মুগ্ধ করে।

এরপর ২০১২ সালের ৮-১০ মে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সের ৮৪তম ব্যাচে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এই কোর্সের প্রতিটি বিষয় তাঁকে আরও অনুপ্রাণিত করে। জেন্ডার, সমাজে নারীর অবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন এই আলোচনাগুলো তার মনকে নাড়া দেয়।

প্রশিক্ষণ শেষে সেতারা নব উদ্দীপনা নিয়ে সমাজের অবহেলিত নারীদের উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শুধু তার ওয়ার্ডেই নয়, কাবিলপুর ইউনিয়নের যে কোন স্থানেই নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে, এমন ঘটনা জানার পর সেখানেই তিনি ছুটে যান। পরামর্শ বা সালিশের মাধ্যমে আপোষ মিমাংসার চেষ্টা করেন। ইউনিয়ন পরিষদের সালিশ কমিটির তিনি একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে প্রতিটি সালিশেই তিনি অংশ নেন। এ পর্যন্ত তিনি ১৬টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছেন আর যৌতুক ছাড়া বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন ১৬টি। জন্ম নিবন্ধন করতে উৎসাহিত করেছেন ৫শ' জন ছেলে-মেয়েকে। তার উদ্যোগে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বসানো হয়েছে ৪০টি এবং টিউওয়েল বসানো হয়েছে ৭টি। নিজ এলাকায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচিকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রেও সেতারা অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন। এ ছাড়া শিশুদের স্কুলে ভর্তি করা ও বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে কাজ করছেন তিনি। সেতারা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির একজন সদস্য। এ ছাড়া তিনি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম কমিটির সদস্য।

সেতারা বলেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'র উজ্জীবক ও নারীনেত্রী প্রশিক্ষণ আমাকে বদলে দিয়েছে। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আগে মানুষের সাথে ভালোভাবে কথা বলতে পারতাম না। আর এখন আমার মতামত ও সিদ্ধান্তকে পরিবার মূল্যায়ন করে। তিনি বলেন, এখন আমি শুধু নিজের কথা ভাবি না। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য বেড়েছে। সবার জন্য ভালো কাজ করার চেষ্টা করি। ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর এবং কাবিখাসহ অন্যান্য সামাজিক উদ্যোগে নারী-পুরুষ সবাই যাতে তাদের সুযোগ পায় সে চেষ্টাই করি।

সেতারা তার সন্তানদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চান। তার জীবনের না পাওয়ার বেদনা যাতে কোনভাবেই সন্তানদের স্পর্শ করতে না পারে, সে চেষ্টাই তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। সেতারা বেগম এখন অনেকটাই পরিপূর্ণ। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আজ একটা পর্যায়ে আসতে পেরেছেন। তার মনোবল বেড়েছে, বেড়েছে জনসমর্থন। আর এটিকে অবলম্বন করেই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যেই কাজ করে যেতে চান তিনি। এটাই সেতারার একমাত্র অঙ্গীকার।

নারী সমাজের পরিবর্তনে নাজমা বেগমের পথচলা

আব্দুল হালিম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার তিতাস নদীর পাড়ে শ্যামলীমায় ঘেরা একটি গ্রামের নাম কালিকচ্ছ। শিক্ষা, সংস্কৃতি আর নানান ঐতিহ্যমণ্ডিত এ গ্রামে ১৯৭৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর নাজমা বেগম জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুল মোতালিব মেম্বার ও মাতা রেজিয়া বেগমের ১২ সন্তানের মাঝে নাজমার অবস্থান অষ্টম।

সমাজের অন্য সব ছেলে-মেয়ের মতই স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠেন নাজমা। মা রেজিয়া বেগম স্কুল শিক্ষিকা। সেই সূত্র ধরে ধর্মতীর্থ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৮০ সনে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন নাজমা বেগম। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৯৮৫ সালে ভর্তি হন কালিকচ্ছ পাঠশালা উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৯৯০ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। আর ১৯৯২ সালে এইচ.এস.সি পাশ করেন সরাইল ডিগ্রী কলেজ থেকে।

এরইমধ্যে অসুস্থ হয়ে নাজমার বাবা মারা যান। কন্যা দায়গ্রস্ত মাতা ১৯৯৬ সালে পাশের ইউনিয়ন নোয়াগাঁও এর রফিকুল ইসলাম মৃধার সাথে নাজমা বেগমের বিয়ে দেন। নাজমা তার স্বামীকে নিয়ে বাবার বাড়িতে থাকতেন। স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগীতা নিয়ে ১৯৯৬ সালে নাজমা বি.এ পাশ করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি স্থানীয় বুশরা কিন্ডারগার্টেন এ সহকারি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। শিক্ষকতা করে সংসার চালানোর পাশাপাশি তিনি পড়াশুনা চালিয়ে যেতে থাকেন। ২০০১ সালে নাজমা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ বি.এড-এ ভর্তি হন। ২০০৪ সালে এম.এ পাশ করেন এবং বিএডএ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এখানেই তিনি থেমে থাকেন নি। ২০০৯ সালে সাউথ ইষ্ট ইউনিভার্সিটি থেকে এ গ্রেডে এম.এড পাশ করেন। শ্বশুর বাড়ির লোকজন ও স্বামীর উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণেই পড়াশুনা করতে পেরেছেন নাজমা।

এরইমধ্যে ১৯৯৭ সালে নাজমার কোল জুড়ে জন্ম নেয় মেয়ে নাইমা ইসলাম এবং ২০০৩ সালে জন্ম নেয় ছেলে তুষ্ট। ছেলে-মেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে নাজমা বেগম ভালভাবেই সংসার সামাল দিতে থাকেন। ২০০০ সালে নাজমা বেগম এম এ বাশার আইডিয়াল ইনস্টিটিউট এ সহকারি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৪ সালে তিনি বুশরা কিন্ডার গার্টেনের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পান। এর পাশাপাশি প্রাইভেট পড়ানো এবং সামাজিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন তিনি। শিক্ষকতা আর সামাজিক কাজকর্মে ব্যস্ত সময় কাটান নাজমা। গ্রামের নারী-পুরুষ সবাই নাজমার কাছে বিভিন্ন পরামর্শ নেয়ার জন্য আসতো। তিনি সাধ্যমত তাদের সহায়তা করতেন।

২০০৯ সালে কালিকচ্ছ ইউনিয়ন পরিদের চেয়ারম্যান এম এ বাশারের আমন্ত্রণে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ১৪৫৬তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণটি আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে এবং তার কাজকর্মের গতি বাড়িয়ে দেয়। এরইমধ্যে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ৪৩তম ব্যাচের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণের পর সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে এসে তিনি ১৫০৬তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণের আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহায়তা করেন। প্রশিক্ষণে ৩৭ জন নারী ও ৩০ জন পুরুষ অংশ নেয়। তার উদ্যোগে 'সুজন' ও কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের কমিটি গঠন করা হয়। নাজমা বেগম সমাজের অবহেলিত প্রতিবন্ধী ৩০ জনকে সেলাই প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। নারীদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে গড়ে তোলেন বারুজীবী পাড়া মহিলা সমিতি। যার মাধ্যমে ৫৪ জন নারী সংগঠিত। এ সময় তার এলাকায় অনুষ্ঠিত হওয়া ৫৯তম 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে তিনি আরও ৫ জনকে যুক্ত করেন। প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীগণ ফিরে আসার পর কালীকচ্ছ ইউনিয়ন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক এর কমিটি গঠন করেন তিনি।

নাজমা বেগমের কাজের গতি প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে। তার কর্মকাণ্ডে সমাজের কিছু মানুষ সমালোচনা করলেও কোন কিছুই তাকে দমাতে পারে নি। ২০১১ সালে স্থানীয় পাঠশালা উচ্চ বিদ্যালয়ে গণিত উৎসবের আয়োজন করেন। গণিত উৎসবের মধ্য দিয়ে নাজমা ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার-এর একটি ইউনিট গড়ে তোলেন।

নাজমা বেগম শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য মা সমাবেশ করেন। এতে শতভাগ শিশুকে স্কুলে ভর্তি এবং শিশুদের যত্ন নেয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া স্যানিটেশনের জন্য আলোচনা সভা, উঠান বৈঠকসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেন তিনি। নাজমার নিয়মিত কাজের মধ্যে অন্যতম হল বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ। ইতোমধ্যে তার এলাকায় তিনি ১৫টিরও বেশি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ছাড়া তার প্রচেষ্টায় একটি যৌতুকমুক্ত বিয়েও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নাজমা বেগম এ বছর আইডিয়াল কিন্ডারগার্টেন নামের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। শিক্ষকতা আর সামাজিক কাজকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রেখে আগামী দিন অতিবাহিত করতে চান তিনি। নাজমা বেগম মনে করেন, তার প্রচেষ্টার কারণে যদি সমাজের বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও আসে তাহলেই তার জন্ম সার্থক হবে।

শাহানার চোখে স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্ন

এ এস এম আখতারুল ইসলাম

দারিদ্র্যের কষাঘাতে মানুষ সাধারণত মুষড়ে পড়ে, হয় আশাহত। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বপ্নবান মানুষেরা দারিদ্র্যকে পরাজিত করে, সাফল্যের স্বপ্ন-দুয়ারে হাজির হয় আর অন্যদের পথ দেখায়। এ রকমই এক নারী সুনামগঞ্জের শাহানা বেগম। দৃঢ় প্রত্যয় আর নিরলস কর্মস্পৃহা দিয়ে দারিদ্র্যকে পরাজিত করে পরিবারে নিয়ে এসেছেন স্বাবলম্বীতা।

শাহানার জন্ম সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার দক্ষিণ বড় কানন গ্রামে। ১৯৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ছয় বছর বয়সে নিজ গ্রাম থেকে ২ কিলোমিটার দূরে দামোদর তরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয় শাহানার শিক্ষাজীবন। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল বাবা আলমাছ আলীর জীবনের অভিজ্ঞতা আর দশটা লোকের থেকে আলাদা নয়। মেয়ে শাহানা যখন ৮ম শ্রেণীতে পড়ে তখন শাহানার বিয়ের প্রস্তাব আসে আলমাছের কাছে। মেয়ের বিয়েতে তার সাঁয় ছিল না। কিন্তু অভাবের সংসারে কন্যাশিশু যেন বোঝা! বাবা আলমাছ আলী রাজী না থাকলেও মা আবজান বেগমের ইচ্ছায় তার এক ফুফাতো ভাইয়ের সাথে মাত্র ১৩ বছর বয়সেই শাহানার বিয়ে হয়ে যায়।

শাহানার শ্বশুরবাড়ি একই উপজেলার সিনচাপইড় ইউনিয়নের গহরপুর গ্রামে। বিয়ের এক বছর পর কোল জুড়ে আসে বড় সন্তান কাওছার আহম্মেদ উজ্জ্বল। অভাবের সংসারে এক এক করে চার সন্তানের জননী হন শাহানা। সংসার চালাতে গিয়ে পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত জমি-জমাগুলোও বিক্রি করে দেন স্বামী শহির উদ্দিন। জমি বিক্রির টাকা শেষ হলে আবারও শুরু হয় অভাবের যাতনা। অনেকটা অনাহারে অর্ধাহারে মানুষ হতে থাকে তার সন্তানেরা। কিন্তু এভাবে আর কতদিন! অভাব-অনটন যখন পিছু ছাড়ছে না, তখন শাহানা নিজেকে আর গুটিয়ে রাখতে পারে না। খুঁজতে থাকেন কাজের উপায়।

এমন সময় গ্রামে ম্যালেরিয়া বন্ধে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের জন্য এক প্রশিক্ষণের আয়োজন চলে। প্রশিক্ষণে অংশ নেন শাহানা। প্রশিক্ষণ পরবর্তী স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে নিয়োগও পান। মাত্র ১ হাজার ৮শ' টাকা বেতনে চাকরিতে যোগ দেন। সামান্য এই টাকা যেন শাহানাকে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দিল। স্বামীর পাশাপাশি তিনিও রাতদিন পরিশ্রম করে সংসারের দুর্ভোগ মেটানোর লড়াইয়ে শামিল হলেন শাহানা।

২০০৭ সালে স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে নিয়োগ লাভের পর তিনি আনসার প্রশিক্ষণে অংশ নেন। পাশাপাশি 'এসআরডিএস' নামক একটি বেসরকারি সংস্থার স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ শুরু করেন। এ ছাড়া, সে সময় কিছুদিন ইউনিয়ন পরিষদের একটি উন্নয়ন প্রকল্পে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এরপর তার জীবনে নতুন আলোকবর্তিকা নিয়ে আসে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। ৮২৬তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণ-এ অংশগ্রহণের ফলে শাহানার জীবনের ভাবনা পাল্টাতে শুরু করে। 'আত্মশক্তিতে বলিয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না' এই শ্লোগানে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের অবস্থা পরিবর্তনে তিনি নতুন শপথ নেন। এ ছাড়া তিনি বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সেও অংশ নেন।

এ প্রশিক্ষণগুলো সংগ্রামী এই মানুষটির কর্মস্পৃহা আর চিন্তা পদ্ধতিকে সুশৃঙ্খল করে তোলে। এরপর নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন শাহানা। স্থানীয় অন্যান্য উজ্জীবকদের নিয়ে একটি সমিতি গড়ে তোলেন তিনি। সমিতি গঠনের মাধ্যমে এলাকায় স্বনির্ভরতা সৃষ্টির এক সামাজিক লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন তিনি। সমিতির বর্তমান পুঁজি প্রায় ২০ হাজার টাকা। এ ছাড়া, ব্যক্তিগত শেয়ারের মাধ্যমে সমিতিতে ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ চালু করেছেন তিনি। এতে এলাকার সাধারণ গরীবরা মহাজনী সুদের কারবার থেকে মুক্তির অবলম্বন খুঁজে পেয়েছেন। শাহানা তার এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নিরাপদ পানি ব্যবহার ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাষণ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করছেন। একইসাথে চোখে এক ক্ষুধামুক্ত ও স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে স্থানীয় নানা সামাজিক সমস্যা নিরসনে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন তিনি।

সমাপ্ত--------